মুসলিম
নারীদের
বীরত্বগাথা
আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ.
অনুবাদ: উম্মে তকি

আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ.

মুসলিম নারীদের বীরত্বগাথা

অনুবাদঃ
উম্মে তকি

অর্পণ

ইলম ও তারবিয়াতের মহীরুহ,
পূর্বসূরিদের দ্বীনী আদর্শ ও দূরদর্শিতার উত্তরাধিকারী
মরহুমা নানীজান হজরত রহিমা খাতুন বিনতে
মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ.-কে
এবং সালাফের পদাঙ্ক অনুসরণকারী
প্রত্যেক ঈমানদার মা-বোনকে।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ মেহেরবানের, যিনি আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের পথ দেখিয়েছেন। 'আমরা পথের দিশা পেতাম না, যদি আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখাতেন'। (আল-আরাফ: ৪৩)

কালের পথপরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ্ এখন এক জটিল যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। আঁধার রাত ও সুবহে সাদিকের মাঝে যেন চলছে লুকোচুরি। মুসলমানের ঘুম ভেঙেও যেন ভাঙছে না। হতাশা ও ভীতির কালো মেঘে এখনও দিগন্ত আচ্ছন্ন।

উম্মাহ্র এই সঙ্গীন ও নাজুক মুহূর্তে মুসলিম নারীর চেতনা ও দায়িত্ববোধ কেমন হওয়া উচিত? কর্মবণ্টন ও দায়িত্বের শ্রেণিবিভাগ কি গাফিলতি ও অলসতার অনুমোদন দেয়? সালাফের আদর্শ ও সীরাত কি শুধু পুরুষদের জন্য? বিষয়গুলো মা-বোনদের ভেবে দেখা উচিত। শুধু ভাবলে হবে না; হিম্মত ও প্রত্যয়, প্রজ্ঞা ও কৌশল, যিকির ও ফিকিরের সাথে কাজে আত্মনিয়োগ করা জরুরী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আসলাফের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শের আলোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো উচিত।

অতীতের হারানো গৌরবের কিছু ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলিম নারীর মাঝে নবপ্রেরণা সঞ্চার করাই এই ছোট্ট বইয়ের উদ্দেশ্য। আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ. এই উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটি রচনা

করেছেন। মুসলমানদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ঘেঁটে এ ধরনের ঘটনাবলি একত্র করতে চাইলে হাজার পৃষ্ঠায়ও তার সংকুলান হবে না। শুধু রণাঙ্গন নয়; শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে নিয়ে সমাজ-সংসার—প্রতিটি অঙ্গনেই মুসলিম নারীর মাহাত্ম্য ও বীরত্বের সোনালি ইতিহাস রয়েছে। বিজ্ঞ লেখক এখানে নমুনা হিসেবে ইসলামের প্রথম যুগ ও মুসলিম ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু ঘটনা সংকলন করেছেন মাত্র।

সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর পাণ্ডিত্য ও রচনা-নৈপুণ্যের কথা সচেতন পাঠক মহলের অজানা নয়। তাঁর বিদগ্ধ কলমের ছোঁয়া ছোট্ট কলেবরের এই পুস্তিকাটিকেও অত্যন্ত গুরুত্বহ করে তুলেছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব মূল্যায়ন ও পর্যালোচনামূলক মন্তব্যগুলো সমৃদ্ধ করেছে বইয়ের বিষয়বস্তুকে।

বইটির পরিচিতি প্রসঙ্গে দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমির সদস্য ড. ইলিয়াস আ'যমি 'দারুল মুসান্নিফীন কী তারীখী খিদমাত' বইয়ে লিখেন (পৃ: ২৩৪-২৩৫):

'সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ. ১৯০৮ ঈসায়ীতে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আন-নাদওয়া'য় 'মুসলমান আওরতুঁ কী বাহাদুরী' শিরোনামে ধারাবাহিক কলাম লিখেন। 'বাহাদুর খাওয়াতীনে ইসলাম' বইটি তারই সংকলিত রূপ। ১৯৫২ সালে ব্যাপক উপকারার্থে নদভী রহ. রচনাটি একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহকারে প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় তুলে ধরেন মুসলিম নারীদের হিম্মত, বীরত্ব ও সাহসিকতার দাস্তান। শুধু আরব নয়, ভারতবর্ষের মুসলিম নারীদের কীর্তিও উঠে আসে তাঁর কলমে।

এই বইয়ের বিষয়বস্তু নারীদের বীরত্বগাথা হলেও উল্লেখিত ঘটনাসমূহ মূলত ইতিহাসেরই অংশ। তাই এখানে বিভিন্ন যুগের যুদ্ধের এবং কিছুটা রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। ঘটনাগুলো নির্ভরযোগ্য

ঐতিহাসিক সূত্রাবলি থেকে শাস্ত্রীয় দক্ষতার সাথে চয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণসমূহে মরহুম সাবাহুদ্দিন সাহেবের একটি দীর্ঘ ভূমিকা যুক্ত হয়। এতে তিনি নদভী রহ.-এর লিখনীর আলোকে ইসলামে নারী অধিকারের ওপর আলোকপাত করেন।

সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর এই বইটিও তাঁর অন্যান্য বইয়ের মত ব্যাপক সমাদৃত হয়। এ পর্যন্ত বইটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ বাজারে এসেছে। মরহুম সাইয়িদ সাবাহুদ্দিন আব্দুর রহমান বইটি ইংরেজিতে অনুবাদও করেন। 'Heroic Deeds of Muslim Women' নামে যা প্রকাশিত হয়। ইসলামিক রিভিউ লন্ডনে প্রকাশের পর তা 'মুহাম্মদ আশরাফ তাজিরে কুতুব' থেকে বই আকারে বাজারে আসে এবং তার অসংখ্য সংস্করণ সমাদৃত হয়।'

বইটির একাধিক সংস্করণ আমাদের সংগ্রহে আছে। কোনোটির শিরোনাম 'খাওয়াতীনে ইসলাম কী বাহাদুরী', আর কোনোটির— 'মুসলমান আওরতুঁ কী বাহাদুরী'। দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমি প্রকাশিত সংস্করণের শিরোনাম—'বাহাদুর খাওয়াতীনে ইসলাম'। 'Heroic Deeds of Muslim Women' নামে প্রকাশিত বইটির ইংরেজি অনুবাদও আমাদের সংগ্রহে আছে।

দামেস্ক থেকে প্রকাশিত ঐতিহ্যবাহী সাময়িকী 'হাযারাতুল ইসলাম'-এ صورٌ من جهاد نساء السَّلَف শিরোনামে কয়েক কিস্তিতে বইটির একাংশের আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই 'সিলসিলা' পূর্ণ হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল হিসেবে সামনে রেখেছি উসমানিয়া বাইতুল ইশাআত, হায়দ্রাবাদ হতে প্রকাশিত ১৩৬৪ হিজরী সালের এডিশনকে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি অনুবাদকে মূলানুগ রাখতে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

বইয়ের প্রায় সকল উদ্ধৃতি মূল উৎসগ্রন্থের সাথে মিলিয়ে পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়েছে। আশা করি, উর্দু নুসখায় বিদ্যমান অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হয়েছে। প্রান্তটীকায় উৎসগ্রন্থসমূহের প্রচলিত সংস্করণের পৃষ্ঠা ও ভলিউম নং যোগ করা হয়েছে।

একটি বিষয়ে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের *দৃষ্টি আকর্ষণ* করছি। তা হলো, এই বইয়ে উল্লিখিত সকল ঘটনা আমাদের জন্য সমানভাবে অনুসরণীয় নয়। বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্ম সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের যুগের পরের ঘটনাগুলো। ঘটনাগুলো পড়লে সাধারণ পাঠকও বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এই বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রেরণা ও মনোবল সঞ্চার করা; প্রায়োগিকক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান নয়। তাই জিহাদে নারীদের অংশগ্রহণের হুকুম কী? অংশগ্রহণের ধরন কেমন হবে? এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর ও নারী-পুরুষের মাঝে যে স্বতঃসিদ্ধ পার্থক্য রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ—এককথায় নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সহযোগিতা সংক্রান্ত শরয়ী নির্দেশনা জানতে অভিজ্ঞ আহলে ইলমের শরণাপন্ন হতে হবে। হাদীস, ফিকহ ও সিয়ার বিষয়ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির সাহায্য নিতে হবে। এ বইয়ে উদ্ধৃত ঘটনাবলি থেকে নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী ব্যাপকভাবে আহকাম গ্রহণ করা উচিত হবে না। সময় ও পরিসরের সংকীর্ণতা না হলে সংক্ষেপে এখানে আমরা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতাম। যেহেতু প্রসঙ্গ ও লক্ষ্য অনেকটা ভিন্ন, তাই এখানে সেসব বিষয়ের অবতারণা করলাম না। এজন্য বইয়ে উদ্ধৃত হাদীস-আসার ও ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর সনদের মান ইত্যাদি নিয়েও আমরা অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই করিনি; বিদগ্ধ লেখকের হাতেই সমর্পণ করেছি সম্মানিত পাঠকদের।

সংসারের ব্যস্ততা ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের পাশাপাশি বাড়তি কোনো কাজে হাত দেয়াটা আমার জন্য একপ্রকার অসম্ভব ছিল। আল্লাহর মেহেরবানিতেই ক্ষুদ্র কিছু করা সম্ভব হয়েছে। মূলত বড় পুত্র মুহাম্মদ

তকির জোর অনুরোধ ও পরামর্শেই বইটির অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। শব্দবিন্যাস ও প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করেছে ছোট দুই পুত্র আহমদ নকি ও মাহমুদ জকি। যত্নসহকারে আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন আবু তকি হাফিজাহুল্লাহ। আমি বিশেষভাবে তাদের প্রতি এবং পরিবারের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকরগুযার। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা না হলে কাজটি অপূর্ণই থেকে যেত। আল্লাহ সবাইকে ইখলাস ও তাকওয়া দ্বারা সজ্জিত করুন, তাঁর পথে জীবন কুরবান করার তাওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নিজ কৃপায় কবুল করুন, এ থেকে কাঙ্ক্ষিত উপকার লাভের ব্যবস্থা করুন, একে আমাদের নাজাত ও ইসলাহের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين.

উম্মে তকি

আয়েশা রাযি. মহিলা মাদ্রাসা

লালখান বাজার, চট্টগ্রাম

২২শে যুলহিজ্জাহ, ১৪৪০ হিজরী

২৪শে আগস্ট, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

academybd76@gmail.com

মুসলিম নারীদের বীরত্বগাথা

ইউরোপের কালজয়ী ইতিহাসে উজ্জ্বলতম কীর্তি বিবেচিত হয় এক বীরাঙ্গনার গল্প—নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে যিনি সিপাহির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পর্তুগালে সফল অভিযানের পর সেখানে আপন ভাই জোসেফকে স্থলাভিষিক্ত করে স্পেনের দিকে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষ অ্যারাগন (Aragon) রাজ্যের রাজধানী সারাগোসায় (Saragossa) মুখোমুখি হয়। নেপোলিয়নের আগ্রাসন মোকাবেলায় স্প্যানিশরা সামরিক শক্তির পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও ব্যবহার করে। স্বজাতিপ্রেম ও মাতৃভূমি রক্ষার উন্মাদনায় জেগে ওঠে গোটা স্পেন। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় প্রত্যেক নাগরিক। মানবজাতির দুর্বল ও কোমল শ্রেণিও এই কঠিন মুহূর্তে মাতৃভূমির জন্য জীবনবাজি রাখতে পিছপা হয়নি।

অবলা নারী ও দুর্বল শিশুদের আত্মত্যাগ আর কী হতে পারে? আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদিই ছিল তাদের কাজ। কাউন্টেস বিউরেটা (The Countess of Bureta)[১] নারী ও শিশুদের নিয়ে একটি দল গঠন করে তাদের দায়িত্ব দিলেন যেন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহিদের নিকট খাবার পৌঁছে দেয়, আহত সৈনিকদের উদ্ধার করে, তাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগায় এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে। এই

---

১. কাউন্টের স্ত্রীরূপ, ইউরোপীয় মহান ব্যক্তিদের উপাধি, ব্রিটিশ আর্লের সমতুল্য। (অনুবাদক)

ঐতিহাসিক যুদ্ধেরই এক গৌরবময় ঘটনা—

সেই দলের এক সদস্য অগাস্টিনা সারাগোসা (Agustina Saragossa) একদিন সিপাহিদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ভয়ংকর দৃশ্য তার চোখে পড়ে। যুদ্ধরত এক গোলন্দাজ সৈনিকের গায়ে গুলি লাগলে সে পড়ে যায়। অন্য সৈনিকেরা শত্রুপক্ষের অগ্রযাত্রা রুখার জন্য সাহস করে নিহত সৈনিকের স্থানে দাঁড়াতে চাচ্ছিল। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে এত তীব্র গুলি বর্ষিত হচ্ছিল যে, তারা বারবার অগ্রসর হয়েও পিছু হটছিল। দুঃসাহসী অগাস্টিনা এক দৌড়ে চলে যান নিহত সৈনিক পর্যন্ত; সে মৃত্যুর আগে শত্রুর দিকে যে কামান তাক করে রেখেছিল, তাতে দেশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মনোবল না হারিয়ে নিরলস লড়াই চালিয়ে যান। তার সাহসী ভূমিকার কারণেই সেদিন সৈনিকরা উজ্জীবিত হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

যুদ্ধ শেষে অগাস্টিনা বুঝতে পারেন, তিনি এ অবদান রেখেছেন তার স্বামীর পক্ষ থেকে, যার মৃতদেহ কামানের ওপাশে পড়ে ছিল। দেশ ও জাতি অগাস্টিনার এই অবদান বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। আজীবন তিনি রাজদরবার থেকে ভাতা পেতেন। ইউরোপের বিশিষ্ট লেখকগণ তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলির মাঝে একে স্থান দেন।

'জোয়ান অফ আর্ক' (Joan of Arc) ইউরোপের এক বীর মহিলা। ১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুরুষের বেশ ধারণ করে সেনাপতি হয়ে অর্লিন্স অবরোধ করেন। পাতের যুদ্ধে (The Battle of Patay) ইংরেজদের পরাজিত করে তিনিই ক্ষমতায় আসীন করেন চার্লস সপ্তমকে। ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে জাদুর জোরে তিনি এই অতিমানবীয় শক্তি লাভ করেছেন—এ অপবাদ দিয়ে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। 'জোয়ান অফ আর্ক'-এর

কীর্তি এতই প্রসিদ্ধি পায় যে, স্কুলের শিশুদের কাছেও তিনি পরিচিত। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাকে সাধু বা সেইন্ট স্বীকৃতি প্রদান করে!

* * *

অপরদিকে, মুসলমানদের ইতিহাসে এজাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা অসংখ্য। দুঃখের বিষয় হল, এসব অমূল্য কীর্তিগাথার উপযুক্ত কদর আমাদের কাছে নেই।

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবেও এই নিয়ম ছিল যে, নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণ করত। মহিলা ও শিশুরা যুদ্ধের সারির পেছনে থাকত। তাদের কাজ হত—আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করা, ঘোড়ার পরিচর্যা করা, তাদের বীর স্বামীদেরকে স্বস্তি দেওয়া, পূর্বসূরিগণের ইতিহাসখ্যাত বীরত্বগাথা আবৃত্তি করে তাদেরকে উদ্দীপ্ত করা, নিহত সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে নেওয়া, পলায়নপর শত্রুদের গ্রেফতার করা, লাশ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

আরবের বিখ্যাত কবি আমর বিন কুলসুম গর্ব করে বলেছেন:

عَلَى آثَارِنَا بِيضٌ حِسَانٌ   نُحَاذِرُ أَنْ تُقَسَّمَ أَوْ تَهُونَا

أَخَذْنَ عَلَى بُعُوْلَتِهِنَّ عَهْداً   إِذَا لاَقَوْا كَتَائِبَ مُعْلَمِيْنَا

لَيَسْتَلِبُنَّ أَفْرَاساً وَبِيْضاً   وَأَسْرَى فِي الحَدِيْدِ مُقَرَّنِيْنَا

ظَعَائِنُ مِنْ بَنِي جُشَمِ بنِ بَكْرٍ   خَلَطْنَ بِمِيسَمٍ حسبًا ودِينًا

يَقُتْنَ جِيَادَنَا وَيَقُلْنَ لَسْتُم   بُعُوْلَتَنَا إِذَا لَمْ تَمْنَعُوْنَا

'আমাদের পেছনে আছে শ্বেতাঙ্গী সুন্দরীরা, আমরা সদা সতর্ক থাকি যেন তাদের অসম্মান না হয়, শত্রু যেন তাদের নাগাল না পায়। স্বামীরা যখন শত্রুবহরের মুখোমুখি হয়, স্ত্রীরা তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়—সওয়ারী, হাতিয়ার ও লোহার শিকল পরিয়ে বন্দী লুটে নেবার। এরা জুশাম বিন বকর গোত্রের নারী—শুধু সৌন্দর্য নয়, ধর্মবিশ্বাস ও বংশ-মর্যাদায়ও তারা অতুলনীয়। তারা আমাদের ঘোড়ার পরিচর্যা করে এবং বলে—শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে না পারলে আপনারা স্বামী হওয়ার যোগ্য নন।'[১]

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রাচীন রীতি ইসলামি যুগেও বহাল ছিল। স্বামীদের সঙ্গে স্ত্রীরাও যুদ্ধে যেত। সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুসারে, উহুদ যুদ্ধে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. নিজ হাতে মশক পূর্ণ করে আহত সৈনিকদেরকে পানি পান করিয়েছিলেন। উম্মে সুলাইম ও উম্মে সালিত নামক দুজন সাহাবিয়াও তাঁর সঙ্গে এই সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।[২]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু নুআইম রহ. থেকে বর্ণিত আছে, খাইবার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছয় জন মহিলাও মদিনা থেকে রওনা হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেন না। তিনি জানতে পেরে রাগান্বিত হয়ে বলেন—'তোমরা কার সঙ্গে বেরিয়েছ? কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে?' মহিলারা আরজ করল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের সঙ্গে ঔষধপত্র আছে। আমরা আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগাব। তাদের শরীর থেকে তীর বের করব। সৈনিকদের খাবারের ব্যবস্থা করব।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা থাকো।' যখন খাইবার বিজিত হয়—অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে তাদেরকেও তিনি গনিমতের অংশ প্রদান করেন।[৩]

---

১. আমর বিন কুলসুমের মুআল্লাকা
২. সহিহ বুখারি: ৪০৬৪; ৪০৭১
৩. সুনানু আবি দাউদ: ২৭২৯

এসব সেবামূলক কাজের জন্য উম্মে সুলাইম রা. ও কিছু আনসারী সাহাবিয়া অধিকাংশ যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন।[১]

হজরত রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িয রা. সহ কিছু মহিলা উহুদ যুদ্ধে শহিদ ও আহতদেরকে ময়দান থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[২] রুফাইদা রা.-এর একটি তাঁবু ছিল, সেখানে তিনি আহতদের ব্যান্ডেজ করতেন।[৩]

উম্মে যিয়াদ আশজায়িয়া রা. সহ আরো পাঁচজন নারী খাইবার যুদ্ধে চরকা কেটে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তারা ময়দান থেকে তীর তুলে আনতেন এবং মুজাহিদদের ছাতু পান করাতেন।[৪]

হজরত উম্মে আতিয়া রা. সাতটি যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য খাবার রান্না করেছিলেন।[৫]

ইবনে জারির তাবারি রহ. লিখেন, মুসলমানগণ নিহতদের একত্র করে কাতারের পেছনে রাখতেন। যারা শহিদদের কাফন-দাফনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা আহতদেরকে মহিলাদের নিকট সোপর্দ করে শহিদগণকে দাফন করতেন। কাদিসিয়া বিজয়কালে সংঘটিত 'আরমাস' ও 'আগওয়াস' যুদ্ধে মহিলা ও শিশুরা কবর খনন করেছিলেন।[৬]

কাদিসিয়া যুদ্ধে উপস্থিত এক মহিলা যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'যুদ্ধ শেষ হলে আমরা কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রের দিকে চললাম। আমাদের হাতে ছিল লাঠি। কোনো আহত মুসলিম সৈনিক দেখলেই আমরা তাকে পানি পান করাতাম এবং উঠিয়ে নিতাম। কোনো

---

১. সুনানু আবি দাউদ: ২৫৩১
২ সহিহ বুখারী: ৫৬৭৯
৩ উসদুল গাবাহ: ৭/১১১
৪ উসদুল গাবাহ: ৭/৩২৩
৫ সহিহ মুসলিম: ১৮১২
৬ তারিখে তাবারি: ৩/৫৫০

কাফিরকে দেখলেই হত্যা করতাম। শিশুরাও একাজে আমাদের সাথে অংশ নিত।'[১]

উপরোল্লিখিত ঘটনাবলি থেকে নারীদের ধর্মীয় উদ্দীপনা, প্রখর মর্যাদাবোধ, চরম সাহসিকতা ও জাতির প্রতি সহমর্মিতাবোধ ছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের নিম্নলিখিত সেবাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়—

১. আহতদের পানি পান করানো;

২. সৈনিকদের খাবার সরবরাহ করা;

৩. কবর খনন করা;

৪. আহত সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে আনা;

৫. আঘাতপ্রাপ্তদের শুশ্রূষা করা এবং

৬. প্রয়োজনের সময় সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

প্রথম যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধের চিত্র যদি এক এক করে সামনে আনা হয়, প্রায় প্রতিটিতে দেখা যাবে তারা কাতারের পেছনে নির্ধারিত দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

শেষোক্ত অবদান সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। যাতে মুসলিম নারীগণ তাদের গঠনগত দুর্বলতাকে ছাপিয়ে এসব কঠিন ও দুঃসহ খেদমত কত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন তা কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম হজরত আনাস বিন মালিক রা.-এর মা হজরত উম্মে সুলাইম রা. সাধারণত সব যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন।[২]

---

১. তারিখে তাবারি: ৩/৫৮১

২. উসদুল গাবাহ: ৭/৩৩৩

হজরত তুলাইব বিন উমাইর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর মা আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রা.-কে জানানো হলে তিনি তাকে বলেন, 'তুমি সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সাহায্য করছ। যদি আমারও পুরুষদের মত সামর্থ্য থাকত আমি তাঁর প্রহরী হতাম এবং তাঁর পক্ষ হয়ে লড়তাম।'[১]

খন্দক যুদ্ধের এক পর্যায়ে ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত পুরনো চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। তারাও একযোগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বনু কুরাইজা মুসলিম নারী ও শিশুদের সংরক্ষিত অবস্থানস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বনু কুরাইজা ও মুসলিম নারী-শিশুদের মধ্যবর্তী এমন কোনো মুসলিম সৈন্যদল ছিল না যারা মহিলাদের নিরাপত্তা দিবে। এমন সময়ে এক ইহুদি মহিলাদের কেল্লার নিকটে চলে আসে। আশংকা ছিল, যদি সে মহিলাদের কথা বনু কুরাইজাকে গিয়ে বলে আসে তারা ময়দান ফাঁকা পেয়ে মহিলাদের ওপর হামলা করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু ও যুবাইর রা.-এর মা হজরত সাফিয়্যা রা. হজরত হাসসান রা.-কে সেই ইহুদিকে হত্যা করতে বলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে সাফিয়্যা রা. নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে নেমে আসেন এবং তা নিক্ষেপ করে ইহুদিকে হত্যা করেন। ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির জাযারি রহ. লিখেছেন, কোনো মুসলিম নারী কর্তৃক কোনো কাফিরকে হত্যা করার এটিই প্রথম ঘটনা।[২]

* * *

উম্মে উমারা রা. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবিয়া। মদিনার একদল মুসলমান হিজরতের পূর্বে কুরাইশের কাফিরদের থেকে লুকিয়ে আকাবায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলামের প্রচার-

---

১. আল-ইস্তিআব: ২/৭৭২

২. উসদুল গাবাহ: ৭/১৭১

প্রসার ও তাঁর সাহায্যের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল মদিনা থেকে আগত মুসলমানদের সর্বপ্রথম দল। এই ছোট্ট দলটিতে উম্মে উমারা রা.ও ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'বাইয়াতে আকাবা' নামে প্রসিদ্ধ।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ পালনের উদ্দেশে মক্কা অভিমুখে রওনা করেন। তিনি মক্কার নিকটে এসে কুরাইশের কাছে প্রবেশের অনুমতি চান। উসমান রা. মুসলমানদের দূত হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন কুরাইশ উসমান রা.-কে শহিদ করে দিয়েছে মর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবি থেকে শাহাদাত ও কাফিরদের সাথে লড়াইয়ের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। হজরত উম্মে উমারা রা. এই বাইয়াতেও শরিক ছিলেন।

এছাড়াও তিনি স্বামী যাইদ বিন আসিম রা.-এর সঙ্গে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি উহুদের ময়দানে যখন মুসলমানগণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন—কাফিররা এগিয়ে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলা করছিল আর জানবাজ সাহাবিগণ জীবনবাজি রেখে লড়ে যাচ্ছিলেন—সেই নাজুক মুহূর্তেও এই বীর মহিলা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে হামলাকারীদের আঘাত করে করে পেছনে হটিয়ে দিচ্ছিলেন। সেদিন তিনি হাতে ও বাহুতে কয়েকটি আঘাত পান। অন্যান্য যুদ্ধেও তাঁর এমন অনুপম বীরত্বের কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে।[১]

হজরত আবু বকর রা.-এর যুগে মুসাইলামা কাজ্জাব নবুওয়ত দাবী করে। অতঃপর ইয়ামামায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। ইয়ামামার যুদ্ধ নামে খ্যাত সেই লড়াইয়ে উম্মে উমারা রা.ও অংশগ্রহণ করেন। হাতে আঘাত পাওয়া পর্যন্ত তিনি দুশমনের বিরুদ্ধে

১. উসদুল গাবাহ: ৭/২৬৯, ৩৬০

লড়াই চালিয়ে যান। সেদিন উম্মে উমারা রা. দেহের বারোটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন।[১]

* * *

হজরত উমর ফারুক রা.-এর যুগে আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে তৎকালীন প্রাচ্যের দুই অজেয় পরাশক্তি—রোম ও পারস্যের মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল রোমকদের সাথে সংঘটিত সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এটি ছিল তাদের জন্য চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ। অপরদিকে কাদিসিয়ার যুদ্ধ ছিল কিয়ানি[২] সাম্রাজ্যের টিকে থাকার অন্তিম সংগ্রাম, পারসিকদের পক্ষে যার চেয়ে বেশি শক্তি ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। এই দুটি যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, পৃথিবীজুড়ে যা ইসলামের প্রসারের পথ নিষ্কণ্টক করেছিল।

এই দুই যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয়ের পেছনে পর্দানশীন মুসলিম নারীদের কর্মতৎপরতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৪ হিজরীর মুহাররম মাসে কাদিসিয়া নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে ইরানিদের মোকাবেলা হয়। ইরানি ফৌজে সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখেরও বেশি, মুসলিম ফৌজে ছিল ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি সৈনিক। এই যুদ্ধে কয়েক হাজার মুসলমান শহিদ হন। মহিলা ও শিশুরা শহিদদের কবর খনন করেন। রণক্ষেত্র থেকে আহতদের উঠিয়ে নেন ও সেবা-শুশ্রূষা করেন।

কাদিসিয়ার যুদ্ধে মহিলাদের কী পরিমাণ উদ্দীপনা ছিল তা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। নাখা' গোত্রের জনৈক বৃদ্ধা নিজ সন্তানদেরকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন—

---

১. বিস্তারিত দেখুন, আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ: ১/১১

২. পারসিক রাজবংশের উপাধি।

«إنكم أسلمتُم فلم تُبدِّلوا، وهاجرتم فلم تُثوبوا، ولم تنبُ بكم البلاد، ولم تُقحِمكم السَّنَةُ، ثم جئتم بأمِّكم عجوزٍ كبيرةٍ فوَضَعْتموها بين يدي أهل فارس، والله إنكم لبَنُو رجلٍ واحد، كما أنكم بنو امرأةٍ واحدة، ما خُنْتُ أباكم، ولا فَضَحْتُ خالَكم، انطلِقوا فاشْهَدوا أوَّلَ القتال وآخِرَه».

'প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে তার ওপর অটল থেকেছ। হিজরত করে আর স্বদেশে ফিরে যাওনি। তবুও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়নি; তোমাদের গ্রাস করেনি দুর্ভিক্ষও। এবার তোমরা বৃদ্ধা মাকে সঙ্গে এনে তাকেও পারস্যবাসীর মুখোমুখি করে দিয়েছ। আল্লাহর শপথ, তোমরা একই মা-বাবার সন্তান। আমি তোমাদের বাবার সাথে খেয়ানত করিনি, অপমানিত করিনি তোমাদের মামাকে। যাও, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে লড়াই করো।'[১]

তারা একযোগে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বীরবিক্রমে লড়াই করে। যখন তারা দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়, বৃদ্ধা মা হাত তুলে দুআ করেন, হে আল্লাহ, আমার সন্তানদেরকে হিফাজত করুন। যুদ্ধ শেষ হলে বীর সন্তানেরা সুস্থ ও নিরাপদে মায়ের কাছে ফিরে আসে এবং গনিমতের মাল মায়ের সামনে এনে রাখে।

কাদিসিয়ার যুদ্ধে আরবের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি খানসা রা.ও অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিল তাঁর চার পুত্র। রাতের প্রথমভাগে যখন সব সৈনিক সকালের ভয়াবহ দৃশ্য কল্পনা করছিল—তখন এই বিপ্লবী কবি নিজ সন্তানদেরকে এভাবেই উদ্দীপ্ত করেন—

«يا بني، إنكم أسْلمتُم وهاجرتم مُختارين، والله الذي لا إله غيره: إنكم لبنو رجلٍ واحد، كما أنكم بنو امرأةٍ واحدة، ما خُنتُ أباكم ولا فضحْتُ خالكم،

---

১. তারিখে তাবারি: ৩/৫৪৪

ولا هَجَنتُ حَسَبَكم، ولا غَيَّرتُ نسبكم، وقد تعلمون ما أعدَّ اللهُ للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خيرٌ من الدار الفانية، يقول الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغْدُوا إلى قتال عدوّكم مُستبصرين، وبالله على أعدائه مُستَنْصرين. وإذا رأيتم الحرب قد شمَّرَتْ عن ساقها، واضطرمتْ لظَى على سِيَاقها، وجلَّلَتْ نارا على أرواقها، فتيَمَّمُوا وطيْسَها، وجالِدوا رئيسَها عند احتدام خميْسِها، تظفروا بالغنم والكرامة، في دار الخلد والمقامة».

'প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছ এবং হিজরত করেছ। মহান আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই—তোমরা যেমন এক মায়ের সন্তান তেমনি এক পিতার সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে খেয়ানত করিনি। মামাদের অপমানিত হতে দিইনি। কলঙ্কিত করিনি তোমাদের বংশমর্যাদা। বিকৃত করিনি তোমাদের বংশপরিক্রমা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলা কী বিপুল সাওয়াব রেখেছেন তোমরা তা জানোই। জেনে রেখো, চিরস্থায়ী আখিরাত এই নশ্বর পৃথিবীর চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।'[১]

১. সূরা আলে-ইমরান: ২০০

ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল সকালে যখন তোমরা সুস্থ ও নিরাপদে রণাঙ্গণে যাবে—অবশ্যই চোখ-কান খোলা রেখে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যখন দেখবে পুরোদমে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সংঘর্ষের আগুন, ময়দান পরিণত হয়েছে অগ্নিগর্ভে, বিভীষিকার চাদরে আচ্ছাদিত পুরো পরিবেশ—তখন ধাবিত হও অগ্নিকুণ্ডের দিকে, জ্বলন্ত শত্রুশিবিরের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ো সেনাপতির ওপর। আল্লাহ তাআলার কৃপায় দুনিয়াতে গনিমত ও আখিরাতে মর্যাদা লাভ করবে।[১, ২]

পরদিন সকালে খানসা রা.-এর চার সন্তান একযোগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বীরত্বের সাথে লড়াই করে চারজনই শহিদ হয়ে যান। খানসার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন—'আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি আমাকে শহিদদের মা হওয়ার সম্মান দান করেছেন!' হজরত উমর রা. তাকে চার সন্তানের ভাতা বাবদ আটশ দিনার দিতেন।

পারসিকদের বিপক্ষে জিসরের যুদ্ধে মুসলমানগণ মর্মান্তিক পরাজয় বরণ করেন। তারপর সংঘটিত হয় বুয়াইবের যুদ্ধ নামে আরেকটি ভয়ানক যুদ্ধ। বুয়াইবের যুদ্ধকে কাদিসিয়া যুদ্ধের ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা যায়। সেই যুদ্ধে ইরানিদের বিপুল পরিমাণ রসদপত্র মুসলমানদের হাতে এসেছিল। মুসলিম নারীদের রেখে আসা হয়েছিল

---

১. উসদুল গাবাহ: ৭/৮৯

২. উপরোক্ত ঘটনাদুটির স্থান, সন্তানদের সংখ্যা ও বেশকিছু শব্দের মিল থেকে বাহ্যিকভাবে দুটোকে একই ঘটনা মনে হয়। কিন্তু এমন অনেক অমিলও রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, ঘটনা দুটি ভিন্ন। প্রথমোক্ত মহিলা ছিলেন নাখা' গোত্রের, আর দ্বিতীয় ঘটনার খানসা ছিলেন আসলাম গোত্রের। প্রথমোক্ত মহিলার বক্তৃতা ছিল সাদাসিধা, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মহিলার বক্তৃতা যেমন দীর্ঘ তেমনি বাগ্মীতাপূর্ণ ও প্রেরণাদীপ্ত—যা খানসা রা.-এর সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাবারি রহ. প্রথম মহিলার ব্যাপারে লিখেছেন যে, তার সন্তানেরা গনিমত লাভ করে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরে এসেছেন। অপর দিকে ইবনুল আসির রহ. দ্বিতীয় মহিলার ব্যাপারে লিখেছেন, তার সন্তানেরা শাহাদাতবরণ করেছেন এবং উমর রা. তাদের ভাতা তাদের মাকে দিতেন।

রণক্ষেত্রের যথেষ্ট পেছনে। খাবারের ব্যবস্থাপনা যেহেতু মহিলাদের দায়িত্বে ছিল—তাই সেনাপতি মুসান্না একটি দলকে সমস্ত রসদপত্র দিয়ে মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সৈনিক-দলটি ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে মহিলাদের তাঁবুর দিকে যেতে লাগলেন। মহিলারা মনে করলেন, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার জন্য আসছে। মহিলারা তাঁবুতে অস্ত্র কোথায় পাবে? তাই তারা শিশুদেরকে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর নিজেরা পাথর ও তাঁবুর খুঁটি নিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। দলটির সেনাপতি উমর বিন আব্দুল মাসিহ দূর থেকে ডাক দিয়ে বললেন, মুসলিম বাহিনীর মহিলাদের এমনই বীর হওয়া উচিত। এই বলে তিনি মহিলাদেরকে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে রসদপত্র সোপর্দ করলেন।[১]

মাইসানের যুদ্ধে নারীগণ বীরত্বের আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। দজলা নদীর তীরে মাইসানবাসী ও মুসলিমগণ মুখোমুখি হন। তৎকালীন সেনাপতি মুগিরা রা. নারীদেরকে রণাঙ্গণ থেকে যথেষ্ট পেছনে রেখে আসেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই হচ্ছিল। আরব-চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ কালাদা'র[২] পৌত্রী আযদাহ বিনতে হারিস মহিলাদের বলেন—'এ সময়ে আমরা মুসলমানদের সহযোগিতা করলে খুবই উপযুক্ত হত।' এই বলে তিনি তাঁর ওড়না দিয়ে একটি বড় পতাকা তৈরি করেন। অন্যান্য মহিলারাও তাদের ওড়না দিয়ে একটি করে পতাকা তৈরি করেন। ওদিকে উভয় পক্ষ ছিল ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত। মহিলারা তখন ঝাণ্ডা উড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর নিকট পৌঁছে যান। অনেকগুলো পতাকা উড়িয়ে মহিলারা মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন। শত্রুপক্ষ মনে করে, মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য তাজাদম

---

১. তারিখে তাবারি: ৩/৪৬৯

২. বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রগ্রন্থ থেকে জানা যায়, আযদা'র পিতা হারিস বিন কালাদাই ছিলেন আরব-চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ; দাদা কালাদা নয়। (অনুবাদক)

সৈন্যদল এসে গেছে। তাদের মনোবল ভেঙে যায়। মাইসানের আকাশ থেকে মুহূর্তেই কেটে যায় কালো মেঘ।[1]

* * *

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর শাসনামলে ১৩ হিজরীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ দামেস্ক আক্রমণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দামেস্কবাসী কেল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মুসলমানরা কেল্লা ঘেরাও করে রেখেছিলেন। পরে জানা যায়, নব্বই হাজার রোমক সৈন্য বিপুল সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আজনাদাইনে একত্র হচ্ছে। বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনী পুরো শামে[2] ছড়িয়ে ছিল। ইরাক পদানত করে হজরত আবু উবাইদা ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. দামেস্কে এসে মুসলিম ফৌজের সঙ্গে মিলিত হন। সকলে স্থির করেন, আগামীকাল পুরো মুসলিম বাহিনীর এক স্থানে একত্র হওয়া উচিত। তাদের মোট সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। সকল সেনাপতি যে যেখানে ছিলেন নিজেদের বাহিনী নিয়ে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হন।

আবু উবাইদা ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. অবরোধ তুলে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হন। হজরত খালিদ রা. বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন। আর হজরত আবু উবাইদা রা. কিছু সৈন্যসমেত নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে তাঁবু ও রসদপত্র বহন করে পেছনে পেছনে আসছিলেন। দামেস্কবাসী দেখতে পেল মুসলমানরা তাঁবু, মালপত্র ইত্যাদি নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাদের মনে হল প্রতিশোধ নেওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কেল্লার ফটক খুলে তারা পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। রোমসম্রাট দামেস্কের জন্য কিছুসংখ্যক সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ

---

১. তারিখে তাবারি: ৩/৫৯৬

২. তৎকালীন যুগে ফিলিস্তিন, জর্দান, সিরিয়ার দামেস্ক, হিম্‌স ও কিন্নাছরিনের সমন্বিত অঞ্চলকে 'শাম' বলা হত। পরবর্তীতে 'শাম' বলতে সাধারণত সিরিয়াকে বুঝাত। বর্তমানে দামেস্ককে 'শাম' বলা হয়। (অনুবাদক)

করেছিলেন। ঘটনাচক্রে তারাও তখন এসে পৌঁছে এবং মুসলমানদের পথরোধ করে। স্পষ্টত তখন মুসলমানদের হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তারা সংহত ও অটল থেকে উভয় দিকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকেন। কিন্তু তাদের মনোযোগ তুলনামূলকভাবে সামনের বাহিনীর দিকে বেশি ছিল। এই সামান্য সুযোগও দামেস্কবাসী হাতছাড়া করেনি। তারা মুসলিম নারীদেরকে জিম্মি করে তাদেরকে নিয়ে কেল্লার দিকে রওনা হয়।

নারীরা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকেন। খাওলা বিনতে আযওয়ার বলেন, 'বোনেরা! তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ কীভাবে এটা মেনে নেয় যে, তোমরা দামেস্কের মুশরিকদের কব্জায় চলে যাবে? তোমরা কি আরবের বীরত্ব ও গৌরবে কলঙ্ক লেপন করতে চাও? এই অপমানের চেয়ে আমার নিকট মৃত্যু শ্রেয়তর।' এই কয়েকটি বাক্য মহিলাদের মনে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। তাঁবুর খুঁটি নিয়ে তারা সার বেঁধে অগ্রসর হতে থাকেন। সবার সামনে বিশিষ্ট সাহাবি যিরার বিন আযওয়ারের বোন খাওলা, তাঁর পেছনে ছিলেন উফাইরা বিনতে গিফার, উম্মে আবান বিনতে উতবা, সালমা বিনতে নোমান বিন মুকাররিন প্রমুখ। কিছুক্ষণের জন্য হতবাক দামেস্কবাসীরা নিশ্চল চেয়ে থাকে। ততক্ষণে মহিলাগণ ত্রিশটি লাশ ফেলে দেন। পরে তারা আবার আক্রমণ করেন। দামেস্কবাসীরা সমূলে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়। এদিকে মুসলিম ফৌজ রোমকদের পরাস্ত করে ফিরে আসে। দামেস্ক ফৌজে প্রাণের যে স্পন্দন ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে যায় সেই আক্রমণে। বাকিরা পলায়নপর হয়ে দামেস্কের কেল্লায় আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী পুনরায় যাত্রা শুরু করে আজনাদাইনের দিকে।

এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) [১৭৩৭-৯৪ খ্রি.] তার ইতিহাসগ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা করে মুসলিম মহিলাদের সতীত্ব, পবিত্রতা, সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন, 'এসব মহিলা

তরবারি চালনা ও তীর-বর্শা নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাই তারা সংকটপূর্ণ সময়ে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হন'।

* * *

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম 'নিয়মতান্ত্রিক' যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার। তবে তারা সকলে ছিলেন আরবের বাছাইকৃত লোক। রোমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল দুই লাখের বেশি। এই মানব-ঝড়টি তীব্র উদ্যম ও প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এক আঘাতেই মুসলিম বাহিনীকে সমূলে উপড়ে ফেলবে। ইয়ারমুকে উভয় ফৌজ মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী ও খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য ছিল চারগুণ। তদুপরি তাদের উন্মাদনা এমনই ছিল যে, ত্রিশ হাজার রোমান পায়ে বেড়ি পরিধান করেছিল, যাতে চাইলেও তারা পিছু হটতে না পারে।

দুই লক্ষ ফড়িঙের ঝাঁক প্রচণ্ড তীব্রতার সাথে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে মুসলিম বাহিনীর ডানপার্শ্ব পিছু হটতে হটতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত চলে যায়। লাখম ও জুযাম গোত্রদ্বয় দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই খ্রিস্টানদের অধীনে ছিল। ইতিপূর্বে তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর বামপার্শ্বে অধিকাংশ তারাই ছিল। রোমান বাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হলে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। রোমান বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে। মহিলাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁবু থেকে বের হয়ে পড়েন এবং এমন তীব্রভাবে রোমান বাহিনীকে আক্রমণ করেন যে, তাদের প্রবল স্রোত মুহূর্তেই থেমে গিয়ে পেছনে সরতে থাকে। তখন মহিলারা পলায়নপর মুসলমানদেরকে থামিয়ে পুনরায় সামনে পাঠিয়ে দেন এবং ফৌজের পেছনে এসে আত্মমর্যাদাবোধ উস্কে দিয়ে তাদের হৃদয়ে উদ্যমের সঞ্চার করেন।

মহিলাদের এই প্রচেষ্টায় মুসলিমদের মাঝে হারানো মনোবল ফিরে আসে। কুরাইশ বংশের নারীরা তরবারি টেনে টেনে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আক্রমণ করতে করতে পুরুষদের অতিক্রম করে এগিয়ে যান।[১]

হজরত মুআবিয়া রা.-এর বোন হজরত জুয়াইরিয়া রা. মেয়েদের একটি দল নিয়ে অগ্রসর হন এবং প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে জখম হন। হজরত মুআবিয়া রা.-এর মা হজরত হিন্দ বিনতে উতবা রা. পুরুষদেরকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করছিলেন—

عضّدوا الغُلْفانَ بسيوفكم

খতনাবিহীন কাফিরদের তরবারি দ্বারা টুকরো করতে থাকো।[২, ৩]

বিশিষ্ট সাহাবি যিরার বিন আযওয়ারের বোন খাওলা রা. এই কবিতা আবৃত্তি করে মুসলমানদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলছিলেন—

يا هاربًا عن نسوةٍ تقيّات رُميت بالسّهم والمَنِيّات

'হে সতী-সাধ্বী নারীদের রেখে পলায়নকারী, তোমরা মৃত্যু ও তীরের লক্ষ্যে পরিণত হও!'[৪]

---

১. তারিখে তাবারি: ৩/৫৭১

২. ফুতুহুল বুলদান: ১: ১৬০

৩. মূল বইয়ে বাক্যটির তর্জমায় ভ্রম হয়েছে। কায়রো ও দামেস্ক মাজমাউল লুগার সদস্য বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ মুহতারাম ড. আজমল ইসলাহীও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। (অনুবাদক)

৪. দ্বিতীয় পংক্তি কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়নি। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে পূর্ণ কবিতাটি এমন:

يَا هَارِبًا عَنْ نِسْوَةٍ تَقِيَّات فَعَنْ قَلِيلٍ مَا تَرَى سبيَّات

ولا حَظِيَّاتٍ وَلَا رَضِيَّات . . . .

'হে সতী-সাধ্বী নারীদেরকে রেখে পলায়নকারী। শীঘ্রই তোমরা স্ত্রীদেরকে বন্দী দেখতে পাবে।...' [৯/৫৬০]

উল্লেখ্য, মূল বইয়ে উর্দু তর্জমায় ভুলক্রমে ـ শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। (অনুবাদক)

ইতিহাসবিদ তাবারি রহ. এই যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে উম্মে হাকিম বিনতে হারিছের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[১] ইবনুল আসির জাযারি রহ. লিখেছেন, হজরত মুআয বিন জাবাল রা.-এর ফুফাতো বোন আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. একাই নয়জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন।[২]

ঐতিহাসিক ওয়াকিদি রহ. ইয়ারমুকের ভয়াল রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন—হজরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা., উবাদাহ বিন সাবিত রা.-এর স্ত্রী খাওলাহ বিনতে সা'লাবা, কা'উব বিনতে মালিক, সালমা বিনতে হাশিম, না'আম বিনতে ফাইয়ায প্রমুখ।[৩]

ইয়ারমুক যুদ্ধের পর ফের মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একদিন তারা দামেস্কের নিকটে 'মারজুস সাফফার' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। খালিদ বিন সাঈদ সেখানেই উম্মে হাকিম রা.-কে বিয়ে করেন এবং মুসলমানদেরকে ওয়ালিমার দাওয়াত খাওয়ান। সেখানকার একটি সেতুর কাছেই উম্মে হাকিমের তাঁবু খাটানো হয়। এখনও সেই সেতু উম্মে হাকিম সেতু নামে খ্যাত। মুসলমানগণ ওয়ালিমার খাবার শেষ করার আগেই রোমান বাহিনী পৌঁছে যায়। মুসলিম বাহিনীও দ্রুত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এত তীব্র আক্রমণ করে যে, রোমকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। উম্মে হাকিম রা.ও চরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর হাতেই সাত রোমান সৈনিকের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়![৪]

---

১. তারিখে তাবারি: ৩/৫৭১

২. উসদুল গাবাহ: ৭/১৬

৩. ফুতুহুশ শাম (ওয়াকিদি): ১/১৯৬, ইয়ারমুক যুদ্ধের আলোচনা

৪. উসদুল গাবাহ: ৭/৩০৯

উষ্ট্রের যুদ্ধে (৩৬ হি.) হজরত আয়েশা রা. কর্তৃক ফৌজ নিয়ে হজরত আলি রা.-এর মোকাবেলায় বের হওয়াকে 'ইজতিহাদি ভুল'[১] গণ্য করা হলেও এর দ্বারা মহিলাদের স্বনির্ভরতা, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততা প্রমাণিত হয় বটে।

ওয়াকিদি রহ. রচিত 'ফুতুহুশ শাম' গ্রন্থের ঐতিহাসিক সূত্রাবলি স্বীকার করে নিলে এই কথা মানতেই হয় যে, শামের বিজয়সমূহে মহিলাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত উম্মে হাকিম, হিন্দ, উম্মে কাসির, আসমা, উম্মে আবান, উম্মে উমারা, খাওলা, লুবনা, 'আফরা রা. প্রমুখ মহিয়সী নারীগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন বীরত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন যা পুরুষদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

উতবা বিন গাযওয়ান হজরত ওমর রা.-এর সেনাপতি ছিলেন। আরব-চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ কালাদা'র পৌত্রী আযদাহ বিনতে হারিস ছিলেন উতবার স্ত্রী। উতবা যখন ফুরাত নগরের বাসিন্দাদের সাথে তীব্র লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন তার স্ত্রী আযদাহ বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন; প্রেরণা সঞ্চার করতেন।[২]

দামেস্ক আক্রমণকালে আবান বিন সাঈদ রা. দামেস্কের শাসক 'তুমা'র হাতে শাহাদাতবরণ করলে তার স্ত্রী উম্মে আবান বিনতে উতবা রা. নিহত স্বামীর সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বের হন এবং দীর্ঘক্ষণ শত্রুর সাথে লড়াই করেন। দামেস্কবাসীরা যদিও অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা সমানতালে নগরপ্রাচীরের চূড়াসমূহ থেকে মুসলমানদের আক্রমণের জবাব দিচ্ছিল। তাদের এক সাধু সম্মুখভাগে স্বর্ণখচিত ক্রুশ হাতে নিয়ে তাদের তিন খোদার নিকট বিজয় প্রার্থনা করছিল। উম্মে আবান ছিলেন তীর নিক্ষেপে সুদক্ষ। তিনি তার দিকে তাক করে

---

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 'ইজতিহাদ' তথা শরয়ী সিদ্ধান্ত উদঘাটন করতে গিয়ে কখনো কখনো 'মুজতাহিদ'গণের যে স্বাভাবিক ভুল হয়ে থাকে, তাকে 'ইজতিহাদী ভুল' বলা হয়। (অনুবাদক)

২. ফুতুহুল বুলদান: ১/৩৩৪

এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করেন যে, ক্রুশ তার হাত থেকে কেল্লার নিচে পড়ে যায়। মুসলমানগণ ছুটে গিয়ে ক্রুশ কবজা করেন। খ্রিস্টানদের সহ্য হচ্ছিল না তাদের মহান ক্রুশের এই অবমাননা। স্বয়ং 'তুমা' ক্রুদ্ধ হয়ে শহরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। এলাকাজুড়ে হৈচৈ পড়ে যায়। মুসলমানরা ঘাবড়ে যান। রোমানরা ক্রুশ ফেরত নিতে শত চেষ্টা করে। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। যেই মুসলমানদের দিকে আসার চেষ্টা করত উম্মে আবানের তীর তাকে ফিরিয়ে দিত। 'তুমা' যখন কিছুতেই ফিরে যাচ্ছিল না—উম্মে আবান তার চোখ লক্ষ্য করে নিপুণভাবে তীর নিক্ষেপ করেন; সে চিৎকার করে পালাতে বাধ্য হয়। তখন উম্মে আবান রা. এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন—

أمَّ أبان فاطلُبي بثأْرك صُولي عليهم صَولةَ المتدارِك

قد ضجَّ جمْعُ القوم من نِبالك

'উম্মে আবান, তুমি নিজ প্রতিশোধ নিয়ে নাও—তাদের ওপর একের পর এক আক্রমণ করো। রোমকরা তোমার তীরের আঘাতে আর্তনাদ করছে।'

ইয়ারমুকের সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ ছিল প্রথম দিন, যা ইয়াওমুত তা'ওয়ির বা অন্ধত্বের দিন নামে খ্যাত। মুসলিম মহিলাদের বীরত্বের এক অভিনব ও আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত এ দিন প্রকাশ পেয়েছিল। নারীগণ সেদিন তরবারি উন্মুক্ত করে রোমানদের ফিরিয়ে না দিলে মুসলমানরা পরাজিত হতেন। হিন্দ, খাওলা, উম্মে হাকিম রা.-সহ আরো অনেক কুরাইশি নারী বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ করেন। আসমা বিনতে আবু বকর রা. ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বামী হজরত যুবাইর রা.-এর সাথে সাথে ছিলেন। হজরত যুবাইর রা.-এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানতালে লড়াই করে যাচ্ছিলেন।[১]

---

১. এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা ওয়াকিদির দিকে সম্বন্ধকৃত ফুতুহুশ শাম গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেহেতু আযদি রচিত ফুতুহুশ শামে সেগুলোর কোনো উল্লেখ নেই—তাই এখানে উদ্ধৃত করছি না।

সিফফিনের যুদ্ধে (৩৭ হি.) অনেক মহিলা হজরত আলি রা.-এর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা লড়াই করতেন এবং আবেগঘন বক্তৃতা দিয়ে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। যারকা, ইকরাশা ও উম্মে খাইর রা. যুদ্ধক্ষেত্রে এমন বক্তব্য রাখেন যাতে সৈনিকদের অন্তরে আগুন জ্বলে ওঠে।[১]

* * *

নব্বই হিজরীতে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতকালে মুসলমানগণ বুখারা আক্রমণ করেন। কুতাইবাকে সেই বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠানো হয়। আরবে আয্‌দ গোত্রের বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল প্রবাদতুল্য। ইসলামের বিজয়সমূহে তাদের কীর্তি ও অবদান অত্যন্ত উজ্জ্বল। বুখারায় বাসকারী তুর্কিরাও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের মোকাবেলায় বের হয়েছিল। আয্‌দ গোত্রের লোকেরা বলেন, প্রথমে শুধু আমাদেরকে শক্তি পরীক্ষা করতে দিন। কুতাইবা তাদেরকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেন। আয্‌দিরা অগ্রসর হয়ে খুব বীরত্বের সাথে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাদের এই মোকাবেলা কোনো মামুলি শক্তির সাথে ছিল না। তুর্কিরা এমন দৃঢ়তার সাথে হামলা প্রতিরোধ করে যে, আযদিরা পিছু হটতে হটতে তাদের তাঁবু পর্যন্ত এসে যান। তুর্কিরা অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের ওপর আরো তীব্র হামলা করে। মহিলারা দেখতে পান মুসলমানগণ পরাজিত হতে যাচ্ছেন। তারা উঠে দাঁড়ান এবং চাবুক মেরে মেরে ঘোড়াগুলোর মুখ পুনরায় ময়দানের দিকে ফিরিয়ে দেন। তারা চতুর্দিকে হৈচৈ ফেলে দেন। মুসলমানরা আবার সাহসের সাথে সামলে উঠে সবেগে পাল্টা আক্রমণ করেন। ফলে তুর্কিরা আর টিকে থাকতে পারেনি। এখানে যদিও মহিলারা তরবারি উত্তোলন করেননি; কিন্তু তাদের প্রচেষ্টাতেই এ বিজয়

---

১. আল-ইকদুল ফারিদ: ১/৩৪৯, ৩৫১ ও ৩৫৪

সহজসাধ্য হয়েছিল। যদি মহিলারা দৃঢ়তা প্রদর্শন না করতেন তাহলে হয়ত মুসলমানগণ ময়দান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতেন।[১]

* * *

ইসলামে খারেজি সম্প্রদায় তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে খুবই প্রসিদ্ধ। কিছু ইসলামি ফেরকার ন্যায় তারা শুধু চক্রান্তের জাল বুনেই ক্ষান্ত হয়নি; বারবার সরকার ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তরবারিও উত্তোলন করেছে। যদিও সাম্য, বাকস্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের সবসময়ই ক্ষমতাসীনদের তরবারির কাছে পরাজিত হতে হয়েছে, তবু বীরত্ব ও দৃঢ়চেতা মনোভাব তাদের মতবাদ দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে রাখে, এখনও যা বিদ্যমান। রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের ধারণাসমূহ এযুগের নিহিলিস্ট (Nihilist) তথা নাস্তিবাদে[২] বিশ্বাসীদের মতই ছিল।

৭৭ হিজরীতে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ছিলেন শামের খলিফা। আর হাজ্জাজ সাকাফি ইরাকের গভর্নর। তখন শাবিব খারেজি সিরিয়ার মসুলে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধসমূহে তার স্ত্রী গাযালা ও মা জাহিযাও অংশগ্রহণ করত। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শাবিবকে দমন করার জন্য একের পর এক পাঁচজন সেনাপতি পাঠায়। কিন্তু একজনও ময়দান থেকে ফিরে আসতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আব্দুল মালিক শাম থেকে বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদের নিয়ে হাজ্জাজ নিজেই বের হয়। মসুল থেকে শাবিব কুফা অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু হাজ্জাজ তার পূর্বেই কুফা পৌঁছে সেখানকার রাজপ্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করে। গাযালা মান্নত করেছিল কুফার জামে মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়বে।

---

১. মূল ঘটনা দেখুন, আল-কামিল (ইবনুল আসির): ৪/২৩

২. নিহিল শব্দের অর্থ শূন্য বা নাস্তি। নিহিলিস্ট দর্শন অনুসারে, জীবনের বিশেষ কোন অর্থ, গুরুত্ব বা উদ্দেশ্য নেই। সকল সমাজসৃষ্ট নীতিবিদ্যাই দিনশেষে বিমূর্ত ও অকার্যকর। নিহিলিস্টরা রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। (অনুবাদক)

দিনের কিছু সময় অতিবাহিত হলে গাযালা মাত্র সত্তর জন মানুষ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে জামে মসজিদে আসে, অথচ পুরো শহর তার শত্রুতে ভরপুর। কুফা শহরে খোদ শামের বাহিনী গিজগিজ করছে। শাবিব উন্মুক্ত তরবারি হাতে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যায় এবং গাযালা মসজিদের ভিতর গিয়ে নিশ্চিন্তে দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়। তাও মামুলি নামায নয়, প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা ও দ্বিতীয় রাকাতে সে সূরা আলে-ইমরান পড়ে, যে দুটির চেয়ে বড় সূরা পবিত্র কুরআনে নেই। দুই-আড়াই পারায় একেকটি সূরা সমাপ্ত হয়েছে। গাযালা নামাজ শেষ করে শত্রুদলের চোখের সামনেই নিজেদের শিবিরে ফিরে যায়।

যুদ্ধ শুরু হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুফা, বসরা ও শামের বাহিনী নিয়ে বের হয়। শাবিবের দল তাদের চেয়ে নেহাত কম হলেও তারা চরম বীরত্বের সাথে লড়াই করে। হাজ্জাজ নিজেই সৈন্যবাহিনীর পেছনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিল। অগ্রসর হতে হতে তারা খারেজিদের মসজিদ কব্জা করে। গাযালা ও জাহিযাও লড়াইরত ছিল। হাজ্জাজ চুপিসারে পেছনের দিক থেকে মানুষ পাঠায় যারা আড়াল থেকে আক্রমণ করে গাজালাকে হত্যা করে। শাবিব নিহতদের ফেলে আহওয়াজের দিকে চলে যায়।

ইবনে খাল্লিকানের মতে, শাবিবের মা জাহিযাও এই যুদ্ধে নিহত হয়। কিন্তু ইবনুল আসির ও তাবারি রহ. বলেন, এর কিছু দিন পর যখন শাবিবের ঘোড়া হোঁচট খেয়ে সেতু থেকে দজলা নদীতে পড়ে যায় এবং শাবিব তার বর্ম ও হাতিয়ারের ভারে ডুবে মারা যায় তখন কেউ তার মাকে গিয়ে বলে, শাবিব মারা গেছে। তার মা বলে, 'শাবিব মারা যাবে? এ হতে পারে না।' পরে দ্বিতীয় দিন যখন বলা হয়, না, সে পানিতে ডুবে মারা গেছে—তখন তার মা বলে, 'এটা হতে পারে'। এ ঘটনা থেকে শাবিবের মায়ের বীরত্বের যেমন অনুমান করা যায়, তেমনি জানা যায় যে, তার মা তখনও জীবিত ছিল।

কোনো কোনো লড়াইয়ে হাজ্জাজ ও গাযালা মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু হাজ্জাজ তার মোকাবেলায় টিকতে না পেরে পলায়ন করে। অথচ এই হাজ্জাজের ভয়েই কাঁপত সারা ইরাক ও হেজায। একজন কবি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাজ্জাজকে ব্যঙ্গ করে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন—

أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُروبِ نَعامَـةٌ فَتْخَاءُ تَنْفُرُ مِن صَفيرِ الصافِرِ

هَلاَّ بَرَزْتَ إِلى غَزالَةَ فِي الوَغَى بَل كانَ قَلْبُكَ فِي جَناحَي طائِرِ

'হাজ্জাজ, নিরস্ত্র আমার ব্যাপারে তুমি হিংস্র সিংহ হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি উটপাখির মতন ভীরু। বাঁশি বেজে উঠতেই তুমি ভয়ে পাংশুমুখে পালিয়ে যাও। গাযালার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুমি কেন বের হতে পারোনি? আরে, তুমি তো ভয়েই ছটফট করছিলে!'[১]

১৩৯ হিজরীতে খলিফা মনসুরের রাজত্বকালে রোম সম্রাট মালাতিয়া নগরী আক্রমণ করে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। খলিফা মনসুরও কায়সারকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান। সালেহ বিন আলি ও আব্বাস বিন মুহাম্মদ ছিলেন এই বাহিনীর সেনাপতি। তারা পৌঁছে প্রথমেই মালাতিয়া নগরী পুনর্গঠন করেন। এরপর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন কনস্টান্টিনোপলের দিকে। পদানত করেন সম্রাট কায়সারের অনেক শহর। সেই বাহিনীতে ছিলেন সেনাপতি সালেহের বোন ও খলিফা মনসুরের ফুফু উম্মে ঈসা বিনতে আলি ও লুবাবা বিনতে আলি। তারা মান্নত করেছিলেন বনু উমাইয়ার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা জিহাদ করব। তাই মান্নত পূরণ করার জন্য তারাও এই জিহাদে শরিক হয়েছিলেন।[২]

---

১. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান: ২/৪৫৫

২. আল-কামিল (ইবনুল আসির): ৫/৭৩

১৭৮ হিজরীতে খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে বিদ্রোহী খারেজি ওয়ালিদ বিন তারিফ খাবুর ও নাসিবিন নগরদ্বয়ে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। দরবারের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ইয়াজিদ শাইবানিকে সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠানো হয়। কয়েকবার লড়াইয়ের পর খারেজিরা পরাজিত হয় এবং ওয়ালিদ মারা যান। ওয়ালিদের বোন ফারি'আ যখন তার ভাইয়ের অবস্থা জানতে পারেন—তৎক্ষণাৎ শিরস্ত্রাণ পরিধান করে হাতিয়ার তুলে নেন। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শাহী ফৌজের ওপর তিনি হামলা করেন। ইয়াজিদ অন্যদেরকে সরিয়ে নিজেই তার মুখোমুখি হন এবং ফারি'আর ঘোড়াকে একটি তীর দ্বারা আঘাত করে বলেন, 'আপনি কেন নিজের বংশের দুর্নাম করছেন? ফিরে যান।' ফারি'আ ময়দান থেকে ফিরে গেলেন, তার চোখ ছিল অশ্রুসজল, তিনি স্বরচিত মর্মান্তিক কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন—

فيا شجرَ الخابُور ما لك مُورِقا — كأنك لم تجْزَع على بنِ طريفِ

فتىً لا يُعِدُّ الزادَ إلا من التُّقى — ولا المالَ إلا من قناً وسيوفِ

فقدْناك فُقدانَ الشباب وليتنا — فَدَيْناك من فِتيانِنا بألُوفِ

عليه سلامُ الله وقْفاً فإنَّني — أرى الموتَ وقّاعاً بكلِّ شريفِ

'হে খাবুর নগরীর বৃক্ষরাজি! ওয়ালিদ বিন তারিফের মৃত্যুর পরও তুমি সবুজ পত্রশোভিত রয়ে গেলে, তোমার মাঝে কোনো অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না যে? সে তো ছিল এমন যুবক, যার পাথেয় কেবলই তাকওয়া-পরহেজগারী, সম্পদ বলতে সে পছন্দ করত শুধুই তীর ও তরবারি। হে ওয়ালিদ! আমরা তোমাকে যৌবনের মতই চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি। হায়! আমরা যদি হাজারো যুবক তোমার জন্য উৎসর্গ করতাম! ওয়ালিদের ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। মৃত্যু তো প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে একদিন আসবেই।'

এই শোকগাথা এতই উচ্চাঙ্গের ও আবেগপূর্ণ যে, অধিকাংশ সাহিত্যবিশারদ একে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপমা হিসেবে গণ্য করেন। আবু আলি কালি রহ. তার 'আমালি' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এই কবিতার প্রথম পঙক্তি এত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে, তাকে আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ ভাষাশৈলীর একটি বিশেষ রূপ—'জ্ঞাতসারে অজ্ঞতার ভান করা'র (Aphtosis) উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, এই শোকগাথা খানসার কবিতার সমপর্যায়ের। তিনি বলেন, ওয়ালিদের এই বোনের নাম ফাতেমা বা ফারি'আ।[১] ইবনুল আসির রহ. বলেছেন—তার নাম 'লাইলা'। ইবনে খালদুন রহ. এই ঘটনা উল্লেখ করলেও কোনো নাম উল্লেখ করেননি। নাম যাই হোক, আমাদের প্রয়োজন তার কর্ম।

* * *

মধ্যযুগে ক্রুসেড-উন্মাদনা শুধু পুরুষদের স্পর্শ করেনি, খ্রিস্টান মহিলারাও আবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। ইমাদ আল-কাতিবের হিসাব অনুযায়ী অসংখ্য খ্রিস্টান মহিলাও ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ক্রুসেড মোকাবেলার যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল মহিলারাও তার প্রভাবমুক্ত ছিল না। উসামা নামে একজন মুসলিম আমির ক্রুসেডবিরোধী যুদ্ধে শরিক হলে তার মা-বোনও তার সঙ্গ দেন। দুজনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং খ্রিস্টানদের ওপর হামলা করতে তাকে সাহায্য করতেন।[২]

মুসলিম মায়েদের এ ধর্মীয় চেতনার ফলে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় শিশু কিশোররাও। খ্রিস্টানরা দীর্ঘ সময় আক্কা অবরোধ করে রেখে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে দীর্ঘদিনের সহাবস্থানের ফলে

---

১. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান: ৬/৩২

২. হুকুকুল মারআতি ফিল ইসলাম: ৫২

মুসলমানদের সাথে তাদের একপ্রকার সম্পর্কও গড়ে ওঠে। তারা প্রস্তাব রাখে, মুসলিম শিশু ও খ্রিস্টান শিশুর মধ্যে মল্লযুদ্ধ হওয়া উচিত। একদিক থেকে দুজন মুসলিম শিশু ও অপরদিক থেকে দুজন খ্রিস্টান শিশু বের হয়। দীর্ঘক্ষণ মোকাবেলা চলতে থাকে। শেষমেশ এক মুসলিম শিশু তার কোমল হাতে এক খ্রিস্টান শিশুকে ধরাশায়ী করে ভেড়াশাবকের মতো বেঁধে ফেলে।[১]

* * *

ইসলামের সমৃদ্ধ ইতিহাসে হিন্দুস্তানের নাম তেমন উচ্চারিত না হলেও মুসলিম নারীর বীরত্বগাথার আলোচনায় হিন্দুস্তানের নাম আসবে অসংখ্যবার। হিন্দুস্তানের ইসলামি ইতিহাসে এমন অনেক মহিলার নাম ভাস্বর হয়ে আছে, যাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবল পুরুষদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল।

শাহ ইলতুৎমিশের মেয়ে রাজিয়া সুলতানার রাজত্বকাল অন্যদের তুলনায় কম হলেও সর্বাগ্রে তিনিই উল্লেখযোগ্য। ইবনে বতুতা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনকালে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। তিনি লিখেন, রাজিয়া পুরুষোচিত পোশাক পরিধান করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে বাইরে বের হতেন। ভারতের সম্রাটগণের রীতি ছিল, তারা শিকারে বের হলে সকল বেগম ও দাসীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদা ইলতুৎমিশ সিংহ শিকারে যান। বেগমরা ছিলেন তার পেছনে। একটি সিংহ বের হয়ে বাদশাহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি রাজিয়া ঘটনাস্থলে না পৌঁছতেন বাদশাহ ভীষণ আহত হয়ে যেতেন। সিংহহৃদয় রাজিয়া তৎক্ষণাৎ তরবারি নিয়ে সিংহের ওপর এমন হামলা করেন যে, সেটি আধমরা হয়ে পড়ে যায়।

---

১. আল-ফাতহুল কিস্সি ফিল-ফাতহিল কুদসি: ১৬৬

পিতা ইলতুৎমিশের পর শাসনভার গ্রহণ করে রাজিয়া এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে, রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তার ভয়ে কাঁপতেন। কিছু আমির-উমারা নিজ কর্তৃত্ব আর চলছে না দেখে তার বিরোধিতা করতে শুরু করেন। সাম্রাজ্যের উজির নিজামুল মুলুক, মালিক ইজ্জুদ্দীন, মালিক সাইফুদ্দীন, মালিক আলাউদ্দীনসহ যারা সাম্রাজ্যের ডান হাত ছিল তারা সকলেই তার বিরোধী হয়ে যায়। নিছক মৌখিক বিরোধিতা নয়, তারা সৈন্য নিয়ে দিল্লী থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাজিয়ার সাহায্যের জন্য যারা বাহির থেকে আসত তাদেরকে তারা ছত্রভঙ্গ করে দিত। কিন্তু রাজিয়া একাই নিজের কৌশল ও শৌর্য-বীর্যে তাদেরকে এমন দিশেহারা করে রাখতেন যে, তারা এদিক সেদিক মার খেত, কিন্তু কোথাও আশ্রয় পেত না। ৬৩৭ হিজরীতে লাহোরের শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি নিজেই ফৌজ নিয়ে বের হন। এরপর বাথিন্দার গভর্নর অবাধ্যতা করলেও তিনিই ফৌজ নিয়ে বের হন। কিন্তু নিজ কর্মচারীদের চক্রান্তের কারণে তিনি পথিমধ্যে গ্রেফতার হন। তারপর দিল্লির জনগণ তার স্থানে তার ভাই মুয়িজ্জুদ্দিনকে বাদশাহ পদে বসায়। রাজিয়া মুক্ত হয়ে নতুন করে আবার সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং কয়েকবার দিল্লির বিরুদ্ধে লড়াই করেন, কিন্তু যেহেতু রাজিয়ার বাহিনী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং সৈনিকগণও নতুন ভর্তিকৃত—তাই তারা পরাজিত হয়।[১]

* * *

এরই ধারাবাহিকতায় একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল আলাউদ্দীন খিলজির যুগে। হিন্দুস্তানে ইসলামের ইতিহাসকে যা নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। দিল্লির সুলতানদের মাঝে আলাউদ্দিন খিলজি এক উজ্জ্বল নাম। তার চেহারায় ফুটে থাকত অবিচলতা, চিন্তার উৎকর্ষ ও জৌলুসপূর্ণ অভিব্যক্তি। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তাতারীদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছিলেন—যাদের বাগদাদ-খাওয়ারিজমের মজবুত

---

১. তাবাকাতে নাসিরি: ১/৪৫৭-৪৬২; তাবাকাতে আকবরি: ১/৬৫-৬৭

কেল্লাও রুখতে পারেনি, চীনের সুউচ্চ প্রাচীর বাধা দিতে পারেনি, দমন করতে পারেনি রুশ বা ইরানি পরাশক্তি। তখন আলাউদ্দীন খিলজি কল্পনা করতেন সুলতান ইস্কান্দরের মত দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যের। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেন, এখন হিন্দুস্তানে এমন কোন রাজ্য নেই—যা আমার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে পারে। 'জালুর' কেল্লার রাজা 'কানিরদেব' রাজদরবারে উপস্থিত ছিল। সে অত্যন্ত হঠকারিতার সঙ্গে অহংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, 'জালুর' কেল্লা কখনো অনুগত হতে পারে না!

সুলতান নাখোশ হলেও উপস্থিত একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি, দু'তিন দিন পর রাজাকে দিল্লি থেকে বিদায় দেন এবং সময় দিয়ে বলেন, জালুরকে যতটুকু পারো নিরাপদ করো। কয়েক মাস পর সুলতান তার এক বাঁদী 'গুলে বেহেশত'কে সেনাপতি বানিয়ে জালুর অভিমুখে প্রেরণ করেন। গুলে বেহেশত তার বাহিনী নিয়ে ঝড়ের গতিতে জালুর পৌছয়। রাজা তার মোকাবেলা করতে না পেরে কেল্লার ফটক বন্ধ করে দেয়। গুলে বেহেশত রাজাকে অবরুদ্ধ করে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে কেল্লা আক্রমণ শুরু করে যা ছিল রাজার কল্পনাতীত। অল্পক্ষণের মধ্যে কেল্লা বিজয় হওয়ার কথা; কিন্তু হঠাৎ গুলে বেহেশত অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতা এত প্রচণ্ড ছিল যে, তার আর বিছানা ছেড়ে উঠা হয়নি। গুলে বেহেশত সব করতে পেরেছিল, কিন্তু মৃত্যুর আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি। তার মৃত্যুতে রাজা যেন সিংহে পরিণত হয়। কেল্লার ফটক খুলে সে শাহী ফৌজকে অনেক পেছনে হটিয়ে দেয়। গুলে বেহেশতের পুত্র শাহিন রাজার হাতে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত দিল্লি থেকে নতুন সেনাপতি কামালউদ্দিন এসে জালুর জয় করে।[১]

* * *

১. তারিখে ফিরিশতা: ১/১১৮

সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর শুরুভাগে পৃথিবীতে এক অভিনব বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কেমন ছিলেন আমির তৈমুর লং? তুর্কিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে একটি ঘূর্ণিবায়ু ধেয়ে আসে। দুলে ওঠে তুর্কিদের মজবুত সালতানাত। কেঁপে ওঠে দামেস্ক ও আরবভূমি। তুঘলক বংশের জাদুর চেরাগও নিভে যায় এই ঝড়ে। আর সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে ওঠে পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্য—ভারতবর্ষের ইতিহাসে যা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য। এই বিজয়ের ফল যদিও তৈমুরের বংশধরগণ সোয়াশ বছর পর আহরণ করে, তবু এই সময়ের সৈয়দ ও লোদীদের রাজত্বও সেই তৈমুর-বংশের ইতিহাসেরই ভূমিকা ছিল। যার শিরোভাগে উজ্জ্বল হয়ে আছে লোদীদের বিরুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি জহিরুদ্দীন শাহ বাবরের জয়লাভ।

এই জয়যাত্রায় নারীদের কি কোনো ভূমিকা ছিল না? তৈমুরের বিপ্লবী সৈন্যদের মধ্যে অনেক নারী ছিল, যারা ময়দানে লড়াই করত, রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীরপুরুষদের মোকাবেলা করত, তরবারি চালাত এবং বল্লম-তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করত। মোটকথা, কোনো ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের চেয়ে কম ছিল না। তৈমুর-বংশের সোনালি ইতিহাসে সেই নারীদের কীর্তি কি চির ভাস্বর নয়?[১]

তৈমুর বংশের শাহজাদারা প্রত্যেকে মহাবীর ছিল, একই বংশের শাহজাদিদেরকে তাদের চেয়ে ভিন্ন দাবী করা অন্যায় নয় কি? বাবরনামা, হুমায়ুননামা ও তুজুকে-জাহাঙ্গীরী সর্বত্র দেখা যায়—তৈমুর-নারীরা অস্ত্র চালনা করতেন ও ঘোড়ায় সওয়ার হতেন, শিকার করতেন ও বাঘ মারতেন, হকি খেলতেন ও তীরন্দাজী করতেন। মোটকথা, সমরশাস্ত্রে তারা খুব সচেতন ছিলেন। তুজুকে-বাবরী পাঠ করলে বোঝা যায়, বাবরের কাবুল, সমরকন্দ, ফারগানা ইত্যাদি বিজয়ে নারীদের অবদান ছিল।

---

১. আজাইবুল মাকদুর ফী আখবারি তাইমুরঃ ১২৪

নুরজাহান তৈমুর বা বাবর বংশের ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই বংশে নবাগত বধূ। নুরজাহান প্রায়ই হাতির ওপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ ও শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে যেতেন। তিনি একটিমাত্র গুলি করে সিংহ বধ করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তুজুকে জাহাঙ্গীরীতে লিখেন, 'একদিন আমি শিকারে বের হই। একটি হাতির ওপর ছিলাম আমি ও রুস্তম খাঁ, আরেক হাতির ওপর ছিল নুরজাহান। সামনে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটি সিংহ। সিংহের ঘ্রাণ পেয়ে হাতি কাঁপতে থাকে। এই তীব্র চাঞ্চল্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নির্ভুল নিশানা করা; তাও হাওদায় বসে—নেহায়েত কঠিন। শিকারের নিশানার ক্ষেত্রে আমার পর রুস্তম খাঁ অদ্বিতীয়। কিন্তু প্রায়ই হাতির ওপর বসে তার নিশানা তিন-চারবার ভুল হয়ে যায়, অথচ নুরজাহান হাওদায় বসে বসে প্রথম ঝড়েই সিংহকে কুপোকাত করে ফেলে।'[১]

নুরজাহান একবার বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সাথে শিকারে বের হন। হঠাৎ সামনে চারটি সিংহ বের হয়ে আসে। কিন্তু নুরজাহানের কপালে সামান্য ভাঁজও পড়েনি। তিনি খুব ধীরস্থিরচিত্তে বন্দুক চালান। দুইটি সিংহকে এক একটি গুলি আর অপর দুটিকে দুই দুইটি গুলি করে শেষ করে দেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর অত্যন্ত খুশী হয়ে নুরজাহানকে অনেক মূল্যবান অলঙ্কার পুরস্কার প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ একজন কবি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন—

نور جہاں گرچہ بصورت زن است   در وصف مرداں 'زن شیر افگن' ست

'নূর জাহান আকৃতিতে যদিও নারী, কিন্তু পুরুষের গুণধন্য, আফগান সিংহের স্ত্রী।'

---

১. তুজুকে জাহাঙ্গীরী: ২৭৯

নুরজাহান যেহেতু প্রথমজীবনে শেরে আফগান আলি কুলি খানের স্ত্রী ছিলেন তাই زن شیر افگن (আফগান সিংহের স্ত্রী) কথাটি কবিতাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

জাহাঙ্গীরের ক্ষমতার শেষভাগে নুরজাহানের ভাই আসফ খানের সঙ্গে সেনাপতি মহাবত খানের দ্বন্দ্বের কারণে[১] নুরজাহান ও বাদশাহ জাহাঙ্গীর উভয়ে মহাবত খানের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না। আসফ খান মহাবত খানকে অপমানিত করতে চেষ্টারত ছিলেন। কাশ্মীর সফরে জাহাঙ্গীর ঝিলাম নদীর তীরে মহিলাদের তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আসফ খান একদিন আগেই নদীর ওপারে চলে গেলে বিদ্রোহী মহাবত খান এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার করেন। নুরজাহান সুযোগ বুঝে নদীর ওপারে গিয়ে সৈন্যদের সাথে মিলিত হন। সেখানে তিনি মন্ত্রীবর্গকে তলব করে ভর্ৎসনা করেন; তাদের বলেন, 'শুধু তোমাদের অসর্তকতার কারণেই বাদশাহ বন্দী হলেন।' তারা একবাক্যে বললেন, 'আগামী কাল আপনার নেতৃত্বে পুরো রাজকীয় বাহিনী নদী পার হয়ে যেভাবে হোক বাদশাহের পদচুম্বন করবে—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সমীচীন হবে।'

সকালবেলা সকল সৈনিক তৈরী হয়। মহাবত খান প্রথমেই সেতু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সৈনিকরা হাতি ও ঘোড়াসমেত নদীতে নেমে পড়ে। নুরজাহানও সওয়ার হন একটি হাতির ওপর। নুরজাহানের সাথে শাহজাদা শাহরিয়ারের বোন ও শাহনেওয়াজ খানের কন্যাও ছিলেন। সৈন্যদল নদীতে থাকতেই মহাবত খান আক্রমণ করে বসে। সৈনিকেরা তো নদীতে এমনিতেই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, এতে তারা একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রচণ্ড বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

---

১. তুজুকে জাহাঙ্গীরী ও অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে মহাবত খানের সাথে দ্বন্দ্বের একাধিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুবাদক)

নুরজাহান খাজা আবুল হাসান ও মুতামিদ খানকে বলে পাঠান—'তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখছ কেন? পাল্টা আক্রমণ করো।' ততক্ষণে মহাবত খানের সৈনিকেরা নুরজাহানের হাতি ঘিরে ফেলে। নুরজাহানের হাওদা তীরের লক্ষ্যে পরিণত হয়ে যায়। একটি তীর হাওদার ভেতর চলে আসে। নুরজাহানের বাহু আহত হয়ে পুরো কাপড় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। শাহজাদি নিজ হাতে তীর বের করে ফেলে দেন। নুরজাহানের সাথে খাজা সাহেবও ছিলেন, তিনিও সাহায্য করেন। নুরজাহানের হাতি ভীষণভাবে আহত হয়ে পলায়ন করে। শেষে অনেক কষ্ট করে তিনি নিজ তাঁবুতে ফিরে যান। যদি হাতি নিয়ন্ত্রণে থাকত তাহলে নুরজাহান লড়াই চালিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হতেন না।[১]

* * *

মীর্জা হাদি তুজুকে জাহাঙ্গীরীর উপসংহারে এক মহিলার বীরত্বের আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একইসঙ্গে যেন তার চরিত্রের কিছুটা নিন্দাও করেছেন—

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে দৌলতাবাদের কেল্লা নিজামুল মুলুকের সাথে সম্পর্ক রাখত। নিজামুল মুলুকের দরবারের কার্যনির্বাহী ছিল হাবশী হামিদ খান। মহল ছিল সম্পূর্ণ হামিদ খানের স্ত্রীর দখলে। বলতে গেলে তিনি ছিলেন অতি সাধারণ একজন মহিলা। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজামুল মুলুকের দরবারে তার প্রভাব সুদৃঢ় হতে থাকে। যখন তিনি বের হতেন রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও সেনাপতিবৃন্দ পায়ে হেঁটে তাকে সঙ্গ দিতেন। নিজামুল মুলুক ছিলেন এই দম্পতির হাতের পুতুল।

সে সময় আদিল খান নিজামুল মুলুকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। নিজামুল মুলুক তাদের মোকাবেলায়

---

১. প্রাগুক্ত: ৪০৪-৪০৫

কাকে পাঠাবেন ভাবতে লাগলেন। হামিদ খানের স্ত্রী বললেন—'আমি নিজেই যাব। জিতলে তো ভালোই, আর হারলে মেয়েদের হার আর কতটুকুই বা অপমানজনক হবে?' নিজামুল মুলুকের সম্মতি পেয়ে হামিদ খানের বেগম সসৈন্যে রওনা হন। পথিমধ্যে সৈন্যদেরকে বখশিশ ও ভাতা দিয়ে খুশি করেন। যখন উভয় পক্ষের মুখোমুখি লড়াই শুরু হয় হামিদ বেগম নিজেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ময়দানে আসেন এবং পাহাড়ের মত অটল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেন। এত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি তার বাহিনীকে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখেন যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই আদিল খানের রাজকীয় বাহিনী হাতি ও গোলাবারুদ রেখে নিঃস্ব হয়ে পলায়ন করে।

মির্জা হাদির ভাষায়—'(হামিদ খান বেগম) চেহারায় নেকাব টেনে ঘোড়ায় আরোহণ করতেন এবং সর্বদা মুক্তাখচিত খঞ্জর ও তরবারি কোমরে বেঁধে রাখতেন। হিন্দুস্তানের ঐতিহ্যবাহী মুক্তাখচিত আংটি পরতেন। এছাড়া সামরিক বেশ-ভূষা ও সরঞ্জাম ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সাথে রাখতেন। বিভিন্ন উপলক্ষে উৎসাহ, বাহবা, ইনাম ও বকশিশ প্রদান করতেন। এমন কোন দিন অতিক্রান্ত হয়নি যেদিন তিনি সাধ্যানুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়াননি এবং বড় অঙ্কের দান করেননি।

আদিল খানের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উচ্চ সাহসিকতার সাথে নিজ সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহ দেন। সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে যুদ্ধ, লড়াই, আঘাত ও আক্রমণের প্রতি উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেন। যুদ্ধের সেই উত্তাল পরিস্থিতির মাঝেও পাহাড়সম অবিচলতার সাথে বিপুল পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করেন। সমস্ত হাতি এবং তোপখানা হস্তগত করে নিরাপদে বিজয়ীবেশে প্রত্যাবর্তন করেন।'[১]

* * *

১. প্রাগুক্ত: ৫০২

মুসলিম নারীদের বিস্ময়কর সাহসিকতার আরেকটি উপাখ্যান—

আদিল রাজবংশের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল বিজাপুর শহর। পুঁচি খাতুন ছিলেন সে সাম্রাজ্যের প্রথম বাদশাহ ইউসুফ আদিল শাহের স্ত্রী। ইউসুফ আদিল শাহ ৯১৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার নাবালক ছেলে ইসমাইল আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কামাল খান দাক্ষিণাত্যে তার নায়েব নিযুক্ত হন। ইসমাইল ছিল নামমাত্র রাজা, আসল ক্ষমতা ছিল কামাল খানের হাতে। এক সময় তার ইচ্ছা জাগে এই নামও মুছে ফেলবেন।

পুঁচি খাতুন কামাল খানের এই ইচ্ছার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি কামাল খানকে বরখাস্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু তিনি কতটুকুই বা পারবেন? রাজদরবারের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও সেনাপতিগণ সবাই ছিলেন কামাল খানের অনুগত। পুঁচি খাতুন এ বাস্তবতায় স্থির হন—হয় কামাল খানকে হত্যা করতে হবে নয়তো আদিল শাহ খান্দান নিশ্চিহ্ন হবে। তিনি সুযোগ বুঝে ইসমাইল আদিল শাহের চাচা ইউসুফ তুর্কিকে সব বুঝিয়ে কামাল খানের কাছে পাঠান। ইউসুফ চুপিসারে একটি খঞ্জরের আঘাতে কামাল খানকে খতম করে দেয়। তারপর ইউসুফ গ্রেফতার হয়ে যায়। শেষমেশ তাকেও অকুস্থলেই একই পরিণতি বরণ করতে হয়।

কামাল খানের মা তখনই কামাল খানের ছেলে সফদর খাঁকে ডেকে সতর্ক করে বললেন, এখনই ইসমাইল আদিল শাহ ও পুঁচি খাতুনকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করো। সমস্ত ফৌজ তোমার সাথেই থাকবে। সফদর খাঁ পিতার লাশ দেখে চিৎকার দিতে চাইল। কিন্তু মা বললেন, 'সাবধান! তার মৃত্যুর খবর যেন প্রকাশ না পায়। সবাইকে গিয়ে বল, "কামাল খান বলছেন, ইসমাইল আদিল শাহের মাথা চাই।"

পুঁচি খাতুন প্রথমেই আন্দাজ করেছিলেন এমন একটি বিপদ হতে পারে! কেল্লায় তখন কামাল খানের পক্ষের তিনশ মোগল ও দু-তিনশ হাবশী ও দাক্ষিণাত্যের সৈন্য ছিল। পুঁচি খাতুন সকলকে ডেকে বললেন, 'তোমরা জানো যে, এই সিংহাসন আদিল শাহের। ইসমাইল এখনো শিশু। কামাল খান আমাদেরকে সরিয়ে নিজেই বাদশাহ হতে চায়। তোমাদের মধ্যে যারা আদিল শাহের সিংহাসনের প্রতি ওফাদার—তারা যেন আমাদের সাথে কেল্লায় অবস্থান করে এবং আমাদের সাহায্য করে। আর যার কাছে নিজের জীবন বেশি প্রিয়—সে যেন কেল্লা থেকে বেরিয়ে যায়। তোমরা শত্রুর আধিক্যকে ভয় করো না; কামাল খান অবশ্যই তার অকৃতজ্ঞতার শাস্তি পাবে।' স্পষ্টত এমন হতাশাজনক অবস্থায় কামাল খানকে ছেড়ে পুঁচি খাতুনের সাথে কে-ইবা থাকবে? তিনশ মোগল থেকে আড়াইশ এবং তিনশ দাক্ষিণাত্যের ও হাবশী সৈন্য থেকে শুধু সত্তরজন সিপাহি পুঁচি খাতুনের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়। আর বাকিরা কেল্লা থেকে বের হয়ে সফদর খানের সাথে মিলিত হয়। পুঁচি খাতুন প্রথমেই কেল্লা বিশ্বাসঘাতকমুক্ত করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। নইলে সংকটকালে যদি তারা শত্রুর পক্ষ নিত তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করত।

পুঁচি খাতুন প্রথমে কেল্লা চারদিক থেকে বন্ধ করে দেন এবং সেই দু-তিনশ সিপাহিকে মহলের ছাদে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি নিজে দিলশাদ আগা, ইউসুফ আদিল শাহের বোন ও আরো কিছু মহিলাসহ ইসমাইল আদিল শাহের সাথে তীর-ধনুক নিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে যান। সফদর খান একটি বড় দল নিয়ে কেল্লার দিকে অগ্রসর হন। পুঁচি খাতুন দিলশাদ আগাসহ অন্য সৈনিকদের নিয়ে সফদর খানের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তখনই আদিল শাহ বংশের এক পুরনো কৃতজ্ঞতাভাজন মুস্তফা আকা পঞ্চাশজন গোলন্দাজ নিয়ে পুঁচি খাতুনের সাহায্যে এগিয়ে আসে। গোলন্দাজ বাহিনী ছাদে উঠে গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করে।

সফদর খান তার মায়ের নির্দেশনামত কর্মপন্থা নির্ধারণ করছিলেন। তার মা বললেন—বড় বড় তোপের গোলা মেরে কেল্লা এখনই ধুলিস্যাৎ করতে হবে। এদিকে পুঁচি খাতুনসহ অন্য মহিলারা বললেন, তোপ এসে গেলে আর কিছু করা সম্ভব হবে না। এর পূর্বেই কোনো কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত হল, সৈনিকরা আত্মগোপন করবে, আর মহিলারা সকলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। শত্রুরা মনে করবে, সৈনিকেরা এসব মহিলাদের রেখে পলায়ন করেছে। এমনই করা হয়। সকল সৈনিক এদিক সেদিক লুকিয়ে যায় আর মেয়েরা ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। শত্রুবাহিনী কেল্লার দিকে তাকিয়ে দেখে, শুধু মহিলারাই আছে। তারা সাহস ফিরে পেয়ে পুনরায় আক্রমণ করে। কেল্লার দরজা ভেঙে ফেললেও মহিলারা একচুলও নড়ে না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। সফদর খান প্রথম দরজা ভেঙে দ্বিতীয় দরজাও ভাঙতে উদ্যত হয়। তৎক্ষণাৎ সিপাহিরা বের হয়ে এমন তীব্র হামলা করে যে, শত্রুরা আর টিকতে পারেনি।[১]

দু-তিনশ মানুষ মিলে আক্রমণকারী বিপুল সংখ্যক ফৌজের মোকাবেলা করা কোনো মামুলি কথা নয়।

* * *

নিজাম শাহী খান্দান দাক্ষিণাত্যে সোয়াশ বছর অত্যন্ত সফলতার সাথে রাজত্ব করে। তাদের রাজধানী ছিল আহমদনগর। তাদের এক শাহজাদি যে বীরত্ব ও স্বনির্ভরতার সঙ্গে সম্রাট আকবরের বাহিনীর মোকাবেলা করেছিলেন তা হতবাক হওয়ার মতই ঘটনা।

চাঁদ খাতুন ছিলেন নিজাম শাহী রাজবংশের কন্যা ও আদিল শাহী রাজবংশের স্ত্রী। আহমদনগরের হুসাইন নিজাম শাহ বাহরি ছিলেন তার পিতা, বিজাপুরের আলি আদিল শাহ তার স্বামী। আলি আদিল শাহের

---

১. তারিখে ফিরিশতা: ২/১৬-১৭

মৃত্যুর পর তিনি বিজাপুর থেকে আহমদনগর চলে আসেন এবং সেখানেই বসবাস করতেন।

সম্রাট আকবর যখন হিন্দুস্তানের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সমাধা করে অবসরলাভ করেন, তার মনে দাক্ষিণাত্য পদানত করার ইচ্ছা জেগে ওঠে। শাহজাদা মুরাদ ও খান-ই-খানানকে এই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়।

তৎকালীন সময়ে আহমদনগরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন বুরহান নিজাম শাহ। তিনি বেরার প্রদেশ বাদশাহ আকবরের হাওয়ালা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিষয়টি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই বুরহান শাহের মৃত্যু হয়। ফলে বেরার প্রদেশ আর আকবরের কব্জায় আসেনি। শাহজাদা মুরাদ ও খান-ই-খানান সুযোগের অপেক্ষায় ফৌজ নিয়ে গুজরাটে পড়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় বুরহান শাহের স্থলাভিষিক্ত ইবরাহীম শাহ আমির-উমারাদের হাতে নিহত হন। রাজদরবারের কার্যনির্বাহী মুঞ্জু খান, আহেঙ্গ খান ও ইখলাস খান তিনজনই ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক রাজ্য বানিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা বেড়ে খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়।

একপর্যায়ে মুঞ্জু খান হিংসার বশবর্তী হয়ে শাহজাদা মুরাদকে লিখে পাঠান—'নিজাম শাহীর শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, আপনি এ দিকে অগ্রসর হোন, আমি আহমদনগর কেল্লা বিনা দ্বিধায় আপনার হাওয়ালা করে দেব।' শাহজাদা মুরাদ রওনা দিলেন। খান-ই-খানানও বাদাখ্শান প্রদেশের গভর্নর শাহরুখ মির্জা, শাহবাজ খান, রাজা জগন্নাথ, রাজা দুর্গা ও রাজা রামচন্দ্রসহ অন্যান্য রাজদরবারীদের নিয়ে রওনা হন। যখন তারা আহমদনগরের নিকটে আসেন, মুঞ্জু খান নিজ অস্থিরচিত্ততার জন্য ভীষণ লজ্জিত হন। কারণ, ততক্ষণে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিরোধী পক্ষসমূহকে দমন করে নিজের প্রভাব বিস্তার করেই ফেলেছিলেন। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেল্লা ছেড়ে দিতে হয়।

চাঁদ খাতুন দেখেন তার পিতৃপুরুষের রাজ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন, যেভাবেই হোক আমি পিতৃপুরুষের রাজ্য রক্ষা করব। তিনি প্রথমে নিজের বিরোধী কিছু আমিরকে কেল্লা থেকে বের করে দেন, আর কাউকে কাউকে কায়দা করে দলে ভেড়ান। গোলকুণ্ডার কুতুব শাহ এবং বিজাপুরের আদিল শাহের কাছে সাহায্য চান। তারপর কেল্লা সব দিকে মজবুত করে শাহজাদা মুরাদ এবং খান-ই-খানানের অপেক্ষা করতে থাকেন। শাহজাদা মুরাদ ১০০৪ হিজরীর ২৩শে রবিউস সানী তার বাহিনী নিয়ে কেল্লার দিকে অগ্রসর হন। অন্য দিকে চাঁদ খাতুনও তোপের মুখ উন্মুক্ত করতে হুকুম দেন। দিনভর মুরাদ কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু চাঁদ খাতুন তাকে এক পাও অগ্রসর হতে দেননি। সন্ধ্যাবেলা মুরাদ ক্লান্ত হয়ে নিজেই পিছু হটেন। দ্বিতীয় দিন শাহজাদা মুরাদ, মির্জা শাহরুখ, শাহবাজ খান ও রাজা জগন্নাথ চারদিকে পরিখা খনন করে কেল্লা অবরোধ করেন। নিজাম শাহ বাহিনীর কিছু নেতা চাঁদ খাতুনকে সাহায্য করার জন্য লড়াই করে কেল্লায় যেতে চাইল; কিন্তু খান-ই-খানান তাদেরকে যেতে দেননি। শাহজাদা মুরাদ ও খান-ই-খানান মাসখানেক কেল্লা অবরোধ করে রাখেন, কিন্তু কেল্লাতে একটি আঁচড়ও লাগাতে পারেননি।

এদিকে চাঁদ খাতুনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহায্যের জন্য আদিল শাহ পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কুতুব শাহও পাঁচ-ছয় হাজার অশ্বারোহী এবং কিছু পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করেন। মুঞ্জু খান, ইখলাস খান, আহেঙ্গ খানসহ নিজাম শাহীর আমিরগণও সেই বাহিনীর সঙ্গী হয়ে যান। সম্মিলিতভাবে তৈরী হয়ে যায় একটি বড় বাহিনী। শাহজাদা মুরাদ এই বাহিনীর কথা জেনে ভীত হয়ে পড়েন। পুরো বাহিনীতে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, নিজাম শাহীর বাহিনী আসার আগেই কেল্লা জয় করতে হবে। এমনি লড়াই করেই তো আর কেল্লায় প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না; তাই তিন মাসে বাহিনীর অবস্থানস্থল থেকে কেল্লার চূড়া পর্যন্ত পাঁচটি সুড়ঙ্গ খনন করা

হয় এবং সেগুলোতে বারুদ বিছিয়ে দেওয়া হয়, যাতে আগুন লাগিয়ে পুরো কেল্লা উড়িয়ে দেওয়া যায়।

চাঁদ খাতুন এসব সুড়ঙ্গের কথা জানতে পেরে সাথে সাথেই বারুদ বের করে মাটি দিয়ে সুড়ঙ্গ ভরতে শুরু করেন। শাহজাদা মুরাদ তাড়াহুড়ো করছিলেন যেন কেল্লা বিজয়ের কৃতিত্ব তারই হয়; খান-ই-খানানের হাতের ছোঁয়া যেন না লাগে। দুপুরে খান-ই-খানান ব্যাতিত অন্য সকল আমির-উমারা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কেল্লার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। পরিকল্পনা হল, একদিকে কেল্লা উড়িয়ে দেয়া হবে অপরদিকে ফৌজ কেল্লা পর্যন্ত পৌছে যাবে। তখনো পর্যন্ত চাঁদ খাতুন দুটি সুড়ঙ্গ মাটি দ্বারা ভর্তি করেছেন। তৃতীয়টি খনন করা হচ্ছিল। শাহজাদা তক্ষুণি সুড়ঙ্গগুলোতে আগুন লাগানোর হুকুম দেন। ফলে এমন ভয়ানক শব্দে বিস্ফোরণ হয় যে, মানুষ মনে করে যেন আসমান ফেটে পড়েছে বা বজ্রপাত হয়েছে। কেল্লার পঞ্চাশ গজ দেয়াল সশব্দে ধসে পড়ল। সামনেই শাহজাদাকে তার রক্তলোলুপ রাজপুত ও মোগলদের সঙ্গে দণ্ডায়মান দেখা গেল। কেয়ামত যেন কায়েম হয়ে গেছে। হতভম্ব হয়ে যায় মানুষ, কাজ ছেড়ে দেয় শ্রমিকরা। সিপাহিদের হাত-পা ফুলে যায়, ফৌজের সেনাপতি পালাতে উদ্যত হয়। মোটকথা, কেল্লাজুড়ে আশ্চর্যরকম উৎকণ্ঠা ও হাহাকার সৃষ্টি হয়।

চাঁদ খাতুনের মনোবল দেখুন। তিনি তখনই অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তরবারি হাতে পর্দা থেকে বের হয়ে আসেন। শাহজাদা ভাবছিল, অপর দুটি সুড়ঙ্গও উড়িয়ে দেওয়া হলে তখন হামলা করা হবে। কিন্তু সে সুড়ঙ্গ কি আর ছিল? তা তো আগেই মাটি করে দেওয়া হয়েছে! চাঁদ খাতুন ততক্ষণে তড়িঘড়ি বিশটি অগ্নিগোলা নিক্ষেপকারী তোপ ফাটলের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন। সকল বাহিনীকে শান্ত করে তিনি আবার লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। মোগল ও রাজপুতগণ মরণপণ হামলা চালায়। শাহজাদা মুরাদ মাথা কুটে মরলেন; কিন্তু চাঁদ খাতুন কেল্লার এক ইঞ্চিও তাকে দখল করতে দেননি। বরং এমন

সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ফৌজকে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখেন যে, কেল্লার পরিখা সন্ধ্যা নাগাদ মোগল ও রাজপুতদের লাশে পূর্ণ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় শাহজাদা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যান। চাঁদ খাতুন সারা রাত অস্ত্রসজ্জিত হয়ে স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে পঞ্চাশ গজ কেল্লার দেয়াল তিন গজ উঁচু করে দেন। সকালবেলা শাহজাদা মুরাদ দেখেন আগের দেয়ালই বহাল আছে। পক্ষ-বিপক্ষ সকলের মুখে মুখে চাঁদ খাতুনের এ দৃঢ়তা, অবিচলতা ও বীরত্বের প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। তখন থেকে চাঁদ খাতুনের উপাধি হয় চাঁদ সুলতান।

এই ব্যর্থতার কারণে শাহজাদা মুরাদের মনের জোর নিঃশেষ হয়ে যায়। আকবরের সেনাপতিদের আর লড়াইয়ের শক্তি থাকেনি। বাধ্য হয়ে তারা সন্ধি করতে চায়। প্রথমে চাঁদ সুলতান অস্বীকার করেন। কারণ বিরোধী পক্ষ ইতিমধ্যে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। আরেকটু চেষ্টা করলেই তারা পরাজিত হবে। কিন্তু যেহেতু লোকজন কেল্লায় অবরুদ্ধ থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল তাই শেষমেশ চাঁদ সুলতান সন্ধি করতে রাজি হন এবং চুক্তি অনুযায়ী বেরার প্রদেশ শাহজাদা মুরাদের হাওয়ালা করে দেওয়া হয়।[১]

ভেবে দেখুন, কোন মহিলা কি এর চেয়েও বড় বীর হতে পারে? সাম্রাজ্যের নড়বড়ে ভিত্তি, সভাসদবৃন্দের কপটতা ও পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ডামাডোলে—দুর্গে সৈন্যের অনুপস্থিতি, নেই রসদপত্র, বিধ্বস্ত প্রাচীর, শুরুতেই দুর্গরক্ষার প্রতি অমনোযোগিতা, সর্বোপরি যুদ্ধ চলছে আকবর দি গ্রেট ও খান-ই-খানানের মত পরাক্রমশালী শত্রুর সঙ্গে—সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আক্রমণকারী শত্রুকে হটিয়ে কেল্লা রক্ষা করা—মুসলিম মহিলাদের বীরত্বের এ কোনো সাধারণ ইতিহাস নয়।

* * *

---

১. জামিউত তাওয়ারিখ: ১৯৯

আমরা এসব কাহিনীর ধারা যে পবিত্রভূমি থেকে শুরু করেছিলাম শেষাংশে তারই একটি অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছি। এটি হল আরব-ভূখন্ডের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল 'ইয়ামান'। পাঁচশ হিজরীর মধ্যভাগে এই এলাকাটি আব্বাসি খেলাফতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে মিসরের ফাতেমি রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ—

ইয়ামানের 'হারায' নামক স্থানে ছিল সুলাইহ বংশের আবাস। তারা ছিল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন কাজী-বংশ। সেখানে যিয়াদ নামের একজন ফাতেমি-মতাদর্শপ্রচারক আগমন করে। স্থানীয় সুলাইহ বংশের এক যুবকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। যুবকটির চেহারায় আভিজাত্য ও সংহত ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। যিয়াদ তাকে নিজ মতাদর্শে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে এবং সফল হয়। তাকে ইসমাইলি মতাদর্শে দীক্ষিত করে। যুবকের নাম ছিল আলি বিন মুহাম্মদ সুলাইহি। হিম্মত ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায় এই যুবক ছিল সবার সেরা। আলির এক চাচাত বোনের নাম ছিল আসমা। মেয়েটি সৌন্দর্য, বিচার-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, বীরত্ব ও সাহসিকতায় উপমাহীন ছিল। আলি আসমাকে বিয়ে করে। খোদায়ি কুদরত যেন দুই অভিনব প্রতিভাকে পরস্পর আবদ্ধ করে ইয়ামানের ভবিষ্যৎ রচনার পথ করে দেয়। উভয়ের হিম্মত ও প্রচেষ্টায় ইয়ামান তাদের করতলে চলে আসে।

শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিটি লড়াইয়ে আসমা ছিলেন আলি সুলাইহির ডান হাত। একবার যখন তিনি স্বামীর সাথে মক্কা মুআজ্জামার দিকে যাচ্ছিলেন শত্রুরা আচমকা চোরাগুপ্তা হামলা করে। সুলাইহির সঙ্গে লোকবল ছিল কম। তিনি পরাজিত হন। আসমাকে শত্রুরা বন্দী করে। বেশ কিছুদিন তিনি তাদের কাছে বন্দী ছিলেন, পরে নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টায় বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসেন। কঠিন নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থেকেও তিনি একটি চিঠি লিখে রুটিতে পুরে ভিক্ষুকের বেশধারী এক দূত মারফত তার পুত্রের কাছে পাঠান। পুত্র এক বড় বাহিনী নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হন এবং আসমা মুক্ত হন। আসমা যতদিন জীবিত

ছিলেন তিনিই ইয়ামানের রানি ছিলেন। ৪৯৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আসমার সাহচর্যে আরো দুই বীর মুসলিম নারী প্রতিপালিত হন। একজন তার কন্যা ফাতিমা অপরজন পুত্রবধূ সাইয়িদা। ফাতিমার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করার কারণে ফাতিমা স্বামীর কাছ থেকে নিষ্কৃতি লাভের সাহসী প্রচেষ্টা চালান। চুপিসারে মায়ের কাছে খবর পাঠিয়ে সেনাসাহায্য লাভ করেন এবং পুরুষের বেশ ধরে প্রস্থান করেন।[১]

পুত্রবধূ সাইয়িদা তার শাশুড়ি আসমার মৃত্যুর পর ইয়ামানের রানি হন। তার স্বামী মুকাররম ছিলেন বিলাসী ও আরামপ্রিয়। সাইয়িদা অত্যন্ত সুচারুরূপে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অসংখ্য স্থাপনা নির্মাণ ও শহর পত্তন করেন, যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা করেন, শত্রুদের তরবারি ও কূটনীতির জোরে পরাস্ত করেন। ফাতেমি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে তার প্রতি যেসব পত্র প্রেরণ করা হত তাতে বড় বড় রাজকীয় উপাধী ব্যবহার করা হত।[২]

* * *

এখনও আমাদের শতশত ইসলামি দেশ ও মুসলিম রাজপরিবারের ইতিহাসের পাতা উল্টানো হয়নি। ইরান, তুর্কিস্থান, রোম-আফ্রিকা, মারাকেশ ও আন্দালুসিয়ার মুসলিম পরিবারসমূহের অগণিত সাহসী নারীদের বীরত্বগাথার সংকুলান হয়নি এই ছোট্ট রচনায়। অথচ সেসব দেশ বা বংশে বীর মুসলিম নারীর অভাব নেই। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, অন্যান্য ব্যস্ততা ও সময়ের অভাব এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে চলুন, শেষ পর্যায়ে এসে আমরা মুসলিম নারীদের ভিন্ন এক বীরত্বের আলোচনা করি, যা

---

১. বইয়ের শুরুতে 'অনুবাদকের কথা' দ্রষ্টব্য।

২. ইয়ামানের ঘটনাবলির উৎস: "তারিখে উমারায়ে ইয়ামানি"।

শারীরিক বীরত্বের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আর তা হলো তাদের আত্মিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মানসিক শক্তি ও সাহসের কিছু নমুনা।

ইসলামের প্রথম যুগে কয়েকজন মুসলিম নারী দ্বীন ও ঈমান রক্ষার তাগিদে কঠিন থেকে কঠিনতর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা কিছুতেই সত্য পথ ত্যাগ করেননি। বিশিষ্ট সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির রা.-এর মা হজরত সুমাইয়া রা.-কে ইসলাম গ্রহণের 'অপরাধে' আবু জাহলের বর্শার আঘাতে নির্মমভাবে শহিদ হতে হয়।

উম্মে ফাকিহা রা. একজন সাহাবিয়া। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজরত উমর রা. তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন। ক্লান্ত হয়ে গেলে বলতেন, 'আমি দয়াপরবশ হয়ে তোকে ছেড়ে দিইনি, বরং আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।' তিনি অবিচল ভঙ্গিতে জওয়াব দিতেন—'উমর, তুমি যদি মুসলমান না হও তাহলে আল্লাহ তোমার এই নির্মমতার প্রতিশোধ নেবেন।'

যান্নিরাহ রা. ছিলেন আরেক সাহাবিয়া। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাকে মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। আবু জাহল তাকে এতো প্রহার করেছিল যে, তিনি অন্ধ হয়ে যান। নাহদিয়া ও উম্মে উবাইস রা. দুজন সাহাবিয়া। তারা উভয়ই ইসলাম গ্রহণের 'অপরাধে' মর্মান্তিক নির্যাতনের সম্মুখীন হন।[১]

* * *

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন বনু উমাইয়ার মোকাবেলায় হিজাযে খেলাফত কায়েম করেন, হাজ্জাজ বিশাল সেনাবহর নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। সঙ্গী-সাথীরা তাঁর কাছ থেকে পৃথক হওয়া শুরু করে। শুধু ছোট্ট একটি নিষ্ঠাবান দল তাঁর সাথে ছিল। হজরত ইবনে যুবাইর রা. আতঙ্কিত হয়ে তাঁর মা হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর

---

১. এসব ঘটনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থ হতে সংগৃহীত।

কাছে গিয়ে বললেন, 'ভালো মনে করলে আমি হাজ্জাজের সাথে সন্ধি করব।' নির্ভীক মা জবাব দিলেন—'পুত্র আমার! যদি তুমি বাতিলের ওপর থাকো তাহলে আজকের অনেক আগেই তোমার সন্ধি করা উচিত ছিল। আর যদি সত্যের ওপর থাকো তাহলে সঙ্গী কম হওয়ায় তোমার অন্তর আতঙ্কিত না হওয়া চাই। হকের পথে অবিচল থাকা কি কম সফলতা?' ইবনে যুবাইর রা. ফিরে গিয়ে সব ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুনরায় মায়ের কাছে বিদায় নিতে গেলেন। মা তাঁকে আলিঙ্গন করলে শরীর খুব শক্ত মনে হল। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন—'মা, আমি জোড়া বর্ম পরিধান করেছি।' মা বললেন—'এটা হকের পক্ষে প্রাণোৎসর্গকারী ব্যক্তির নীতি হতে পারে না।' ইবনে যুবায়ের রা. বর্ম খুলে ফেললেন। তারপর বললেন, 'শত্রু যদি আমার শরীর টুকরো টুকরো করে! আমার ভয় হচ্ছে!' মা উত্তর দিলেন, 'বেটা! বকরি জবেহ করার পর চামড়া ছাড়ানোর কষ্ট সে অনুভব করে না।' এভাবেই মা তাঁর ছেলেকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে উৎসর্গ করলেন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে।

হজরত ইবনে যুবাইর রা.-এর শাহাদাতের পর হাজ্জাজ তাঁর লাশ রাস্তায় শুলিতে চড়িয়ে দেয়। কিছুদিন পর হজরত আসমা রা. ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় শুলির ওপর পুত্রের লাশ দেখতে পান। এমন কোন মা আছেন যিনি এই দৃশ্য দেখার পর শোকে উন্মাদ হবে না? কিন্তু তিনি নিস্পৃহভাবে চলে যান, ঝুলানো লাশের দিকে ইঙ্গিত করে রূপক ভাষায় বলেন, 'এই শাহসওয়ার এখনও কি ঘোড়া থেকে নামেনি?'[১]

এই আত্মিক বীরত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অনুপম ধৈর্যের দৃষ্টান্ত আর কোথাও কি পাওয়া যাবে?

* * *

১. তারিখে তাবারিতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর শাহাদাত সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আরো দেখুন, তারিখে ইয়াকুবি: ২/৮২০ (অনুবাদক)

বিদায়গ্রহণের পূর্বে আরেকটি দৃশ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরছি। গ্রানাডার শেষ সুলতান আবু আব্দুল্লাহ সর্বশেষ দুর্গের চাবি খ্রিস্টান বিজয়ীদের হাতে সোর্পদ করে নিজের ক্ষুদ্র দল নিয়ে চলে যাওয়ার পূর্বে ছয়শ বছর মুসলমানদের পদানত থাকা জমিনের দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষবারের মত দেখছিলেন। তখন তাঁর মা আয়েশা এগিয়ে এসে বললেন—'পুত্র আমার, পুরুষ হয়ে যা তোমরা রক্ষা করতে পারোনি তার জন্য মেয়েদের মত খুব কান্নাকাটি করে নাও।'[১]

দেখুন এই ছোট্ট বাক্যে কী পরিমাণ দৃঢ়তা ও অবিচলতা মিশে আছে।

মুসলিম বীর মহিলাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে ক্ষুদ্র পরিসরে। এখন প্রশ্ন হল, এ যুগের মুসলিম নারীগণ ভবিষ্যৎ-ইসলামি ইতিহাসের জন্য পৃথিবীতে কী কীর্তি রেখে যেতে চান?

সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী (রহ.)

সমাপ্ত

১. দি মুর্‌স ইন স্পেইন: ২৬৭

গ্রন্থপঞ্জি:

- সহিহ বুখারি, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারি রহ. (২৫৬ হি.)। দারু তাওকিন নাজাত।

- সহিহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরি রহ. (২৬১ হি.)। মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকীর সংস্করণ।

- সুনানু আবি দাউদ, ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস আস-সিজিস্তানি রহ. (২৭৫ হি.)। মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ।

- মুআল্লাকা, আমর ইবনে কুলসুম।

- উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ, ইবনুল আসীর আল-জাযারী রহ. (৬৩০ হি.)। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

- আল-ইস্তিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, হাফেয ইবনু আবদিল বার রহ. (৪৬৩ হি.)। দারুল জীল।

- আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ, সাইয়িদ দিহলান। 'আমেরিয়া, মক্কা, ১৩০২।

- তারিখে তাবারি, ইবনে জারীর তাবারী রহ. (৩১০ হি.) দারুত তুরাস, বৈরুত।

- ফুতুহুল বুলদান, আল বালাযুরী (আহমদ ইবনে ইয়াহয়া) রহ. (২৭৮ হি.)। দারুল হিলাল, বৈরুত।

- ফুতুহুশ শাম, মুহাম্মদ ইবনে ওমর আল ওয়াকিদি (২০৭ হি.)। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

- আল-ইকদুল ফারিদ, ইবনু আব্দি রাব্বিহ (৩২৮ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

- আল-কামিল, ইবনুল আসীর আল-জাযারী রহ. (৬৩০ হি.)। দারুল কিতাবিল আরবি, বৈরুত।

- ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান, শামসুদ্দিন ইবনে খাল্লিকান (৬৮১ হি.)। দারু সাদির, বৈরুত।

- হুকুকুল মারআতি ফিল ইসলাম, আহমদ আজায়িফ বেগ। ২০১৩ সালে হিন্দাভি ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত।

- আল-ফাতহুল কিস্‌সি ফিল-ফাতহিল কুদসি, ইমাদুদ্দীন ইবনুল কাতিব (৫৯৭ হি.)। দারুল মানার।

- তাবাকাতে নাসিরি, কাজিউল কুজাত আবু উমর মিনহাজুদ্দীন সিরাজ জুযজানি (১৬৬০ খ্রি.)। 'দুনিয়ায়ে কিতাব' প্রকাশনী, তেহরান থেকে আব্দুল হাই হাবিবির তাহকিকে দুই খন্ডে প্রকাশিত।

- তাবাকাতে আকবরি, মির্জা খাজা নিজামুদ্দীন আহমদ বখশী। ১ম সংস্করণ, নাওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ।

- তারিখে ফিরিশতা, মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা (১৫৬০-১৬২০ খ্রি.)। নাওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ।

- আজাইবুল মাকদুর ফী আখবারি তাইমুর, ইবনে আরবশাহ (আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ)। কলকাতা হতে প্রকাশিত, ১৮১৭ ইং।

- তুজুকে জাহাঙ্গীরী, সম্রাট নুরুদ্দীন মুহাম্মদ সালিম জাহাঙ্গীর (১৬২৭ খ্রি.)। ইস্পাহান থেকে প্রকাশিত, মারকাজে তাহকীকাতে রায়ানাহ।

- জামিউত তাওয়ারিখ, রশিদুদ্দিন ফজলুল্লাহ হামাদানি ইলখানি (১৩১৮ খ্রি.)।

- তারিখে উমারায়ে ইয়ামানি, ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডন।

- তারিখে ইয়াকুবি, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসহাক ইয়াকুবি (৮৯৭ হি.)। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে নেদারল্যান্ডের লাইডেন থেকে প্রকাশিত।

- দি মুর্‌স ইন স্পেইন; স্ট্যানলি লেইনপুল। লন্ডনের T. Fisher Unwin কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ।

লেখক পরিচিতি

সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ. (১৩০২-১৩৭৩ হি./১৮৮৪-১৯৫৩ ইং) উপমহাদেশের অবিসংবাদিত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব; বিরলপ্রজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। আল্লামা শিবলী নুমানীর যোগ্যতম শিষ্য ও অনুজ। হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ইজাযতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট মনীষীদের অন্যতম। জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বৃটিশ ভারতে খিলাফাহ কায়েমের জন্যে যারা সোচ্চার হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের সভাপতি পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমিকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র থেকে দেদীপ্যমান সূর্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। আল্লামা শিবলীর অন্তিম অনুরোধে তাঁর অসমাপ্ত 'সীরাতুন নবী'র ৩য়-৭ম খণ্ড রচনা করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রত্যেকটিই মাস্টারপিস এবং স্ব স্ব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের মর্যাদা রাখে। তন্মধ্যে কয়েকটি: আরদুল কুরআন, সীরাতে আয়েশা রাযি., খুতবাতে মাদ্রাজ, নুকুশে সুলাইমান, আরবুঁ কী জাহাযরানী, মাকালাতে সুলাইমান, হায়াতে শিবলী ইত্যাদি।